পাহাড়তলির দুই কন্যা

সুবোধ সরকার

পাহাড়তলির দুই কন্যা

শ্রীবীরু সরকার

লোক সাহিত্য সংসদ

শ্রীবীরু সরকারের বই

তিন নারী এক আকাশ

পাহাড়তলির দুই কন্যা

গ্রাম-সংস্কৃতির রূপান্তর

(যন্ত্রস্থ)

আমার প্রথম উপন্যাস 'তিন নারী এক আকাশ' বের হওয়ার পর সুধী মহল থেকে আরো লেখার তাগিদ এল। সাংবাদিক জীবনে উপন্যাস রচনা ও সাহিত্য অনুসন্ধানের সুযোগ নেই বললেই চলে। হাতের কাছে ছিল এক কাহিনী। ভাবলুম বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষামূলক গল্প হিসেবে এ কাহিনীর হয়ত প্রয়োজন আছে।

১৯৪২ সাল।

একদিকে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ, অপরদিকে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদের দুর্ধর্ষ সংগ্রাম চলেছে। উত্তর বংগের শেষ সীমানা ভূটান পাহাড়ের সানুদেশের চা-বাগানগুলিতে মহাযুদ্ধ অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। এ সময় একদল ফেরারী বিপ্লবী ভূটান পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কোহিমা-বার্মার পথে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কাহিনীর নায়ক 'রঞ্জত' তাঁদেরই একজন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে ফেরারী বিপ্লবী 'রঞ্জত'কে ঘিরে ভূটান পাহাড়ের পাদদেশে একটি কাহিনী গড়ে উঠেছিল; সে কাহিনীর ছায়া অবলম্বন করে 'পাহাড়তলির দুই কন্যা' রচনা করেছি।

শরদিন্দু সরকার

১৫ই আগষ্ট
১৯৬৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার ফেরারী জীবনের একটি মাত্র দিনের কয়েকটি মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতির দণ্ড আমাকে ভোগ করিতে হইয়াছে।

কতবার না সেই প্রগল্‌ভতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম। দলছাড়া সাথীহীন একাকী আত্মপরিচয় গোপন করিয়া সংসারের আর পাঁচজনের মত তাহাদের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণ মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। এবং তাহা করিতে গিয়াই এই অনর্থ কাণ্ড বাধাইয়া বসিলাম। নিজের গুণ জাহির করিলাম।

কিন্তু এই গুণ তখন কোথায় ছিল। যখন দিনের পর দিন শিকারী কুকুরের মত আই-বি ইন্সপেক্টর বংশী গুপ্ত আমাদের পিছন পিছন ছুটিতেছিল। মোমিন খাঁর খালে যখন আমাদের নৌকা পুলিশ আটক করিল—যে হাতের আঙুলে হারমোনিয়মের রীড টিপিলাম সেই আঙুলেই রাইফেলের ট্রিগার টিপিয়াছি। প্রকাশ মরিল। যতীন আর পাগল আহত হইয়া ধরা পড়িল। আমি, সন্তোষ ও সাধন খাল সাঁতরাইয়া জংগলে জংগলে অনাহারে পিপাসায় দিন কাটাইয়াছি। তখন কোথায় ছিল আমার এই গুণ! ছোট মাসীমার সংগে বাজনা না হয় গান গাহিতে শিখিয়াছি। রবীন্দ্র সংগীতও চর্চা করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া এক ঘর ভর্তি মানুষের বাহবা পাইবার সময় যে ইহা নহে তাহা যেন সত্য সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

সেই কথা বলি।

সাহুজীর সহিত পলাশবাড়ীর ক্লাবে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। আজ মনে হইতেছে সেদিন না আসিলেই ভাল হইত। আসিলামই যখন সামান্য মাত্র একটি গানের লোভ সামলাইতে না পারিয়া এ কি কাণ্ড

করিয়া বসিলাম। সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন চা-বাগানের এক গোষ্ঠী নরনারীর সম্মুখে গান গাহিয়া বসিলাম। কাঁঠালঝুড়ির বাগান-বাবু মিঃ দত্তের শ্যালিকা হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতেছিলেন। সেদিন কি উপলক্ষে ক্লাবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাহুজী কাঠের কারবারী। রাজপুতানার লোক। বাঙালী ক্লাবের একজন উৎসাহী সদস্য। বানারহাট রেল ষ্টেশনে তাঁহার সহিত আমার আলাপ। অনুগ্রহপূর্বক তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি নাবালক পুত্রের হাতেখড়ি দেওয়ার সাথে গৃহশিক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলাম। অন্যান্য দিন তিনি মিসেস্‌কে সংগে আনিতেন। সেদিন কেন জানিনা মিসেস্ ক্লাবে আসিলেন না। তাহার জায়গায় আমাকে বসাইয়া সাহুজী মোটর হাঁকাইয়া ক্লাবে আসিলেন।

বেশ চলিতেছিল। সন্ধ্যা তখন হয় হয়, চায়ের পাত্র হাতে বেয়ারা বাবুর্চী ছুটিতেছে। ঠিক এমন সময় মিঃ দত্তের শ্যালিকা ডলির গানের পরেই চা বাগানের বাবুদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল। 'রবি ঠাকুরের' গানের মত নাকি গান নাই। ডলি যে গান ধরিয়াছিল উহা রবীন্দ্রনাথের গান। পলাশবাড়ীর অফিসবাবুর ধারণা যেহেতু ঐ গানটি সিনেমার নায়িকা কণ্ঠে গীত হইয়াছে; আর যাহাই হউক কিছুতেই 'রবি ঠাকুরের' গান হইতে পারে না। গায়িকা ডলি যে নির্ভুল গাহিতে পারিল না, কণ্ঠে যথার্থ সুর তুলিতে পারিল না তাহা কেহই বুঝিল না। সামান্য কথা কাটাকাটি হইতে প্রলয় তর্কের সূচনা হইল। এক গোষ্ঠী মানুষের সম্মুখে অসহায় ডলির করুণ অবস্থার জন্যই হউক অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচারের কারণেই হউক স্থির থাকিতে পারিলাম না। গুনগুন কণ্ঠে সেই গানটা গাহিতে লাগিলাম। আমি ক্লাব ঘরের এক কোণে একটি টুলের উপর বসিয়াছিলাম। আমার গুনগুন সুর ধরা পড়িয়া গেল।

ফাষ্টরীবাবু পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে দুই হাতে টানিয়া গাজনের সন্ন্যাসীর মত বার কয়েক শূন্যে ঘুরপাক করাইয়া চিৎকার করিয়া কহিলেন, "পেয়েছি···পেয়েছি"।

শতবার আমার অদৃষ্টের দুষ্টলক্ষ্মীকে ভৎর্সনা করি। সেই মুহূর্তে প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। ক্যাক্টরীবাবু হিড়হিড় করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

নিজেকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তিনি সকলের সম্মুখে বাদ্য যন্ত্রের পাশে আমাকে বসাইয়া সকলের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "রবি ঠাকুরের গান কাকে বলে শুনুন"।

তর্ক কোলাহল থামিল। সাহুজী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা"।

পাশে দেখিলাম ডলি আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া আছে। ঘরভর্তি জোড়া জোড়া চক্ষু যেন আমাকে গিলিতেছিল।

বোধকরি চা বাগানের চেনা মহলে আমি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই আমার কণ্ঠের সমাদর হইল। একটির পর একটি, অনেকগুলি গান যেরূপ করতালি বাহবা কুড়াইয়া আনিল—তাহা নিশ্চয়ই আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় কাহিনী। তথাপি একটি মুখ আমাকে আর দেখিল না এবং তার দুই হাতও বাজিল না। সে ডলি।

সাহুজী আমাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন; না তাঁহার ব্যবসায়ের অংগ হিসাবে আমাকে ব্যবহার করিতেছেন উহার হিসাব তখন করি নাই। স্বয়ং সাহুজী আমাকে লইয়া বাগানে বাগানে গানের নেমন্তন্ন রক্ষা করিতে লাগিলেন। বাঙালীবাবুদের সহিত তাঁহার মেলামেশার এই হেন সুযোগ তিনি পুরা মাত্রায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাহুজীর বাসায় আমার আদর বাড়িয়াছে। এমনকি তাঁহার গাড়িখানাও আমি যখন তখন ব্যবহার করিবার অধিকার পাইলাম।

—না। ও কথা আমি শুনবো না।

—তবুও বলছি শুনুন।

—না! না!! না!!!

—বেশ।

—যতদিন গান পুরোপুরি না শিখবো, আপনার ছুটি নেই।

—কি মুশকিল। অন্ততঃ একটিবার শুনুন।

—না। কিছুতেই না। যতক্ষণ 'শুনুন' 'শুনুন' ততক্ষণ শুনছি না।

—আমি বয়সে বড় স্বীকার করি। কিন্তু কোথাকার কে এক রাস্তার নিরাশ্রয় মানুষ হঠাৎ তুমি বললে নিশ্চয়ই সুন্দর শোনাবে না।

—ঠিক উল্টোটি বললেন। মাষ্টারমশাই ছাত্রীকে আপনি বললে মিষ্টি শোনাবে।

—আমি যে মাষ্টার তাই বা কে বললে?

—কে নয় বলুন! দু'টো বাচ্চাকে এ, বি, সি, ডি না শিখিয়ে একজন ছাত্রীকে গান শেখালে বুঝি মাষ্টার হয় না!

এই বলিয়া ডলি এক মুহূর্ত মৌন থাকিল। তারপর আবার সে কহিল; আচ্ছা, গানের মাষ্টার হতে আপনার এত আপত্তি কেন?

সহসা এই প্রশ্নের জবাব মিলল না। নীরবে ভাবিতে লাগিলাম।

—মাষ্টার মশাই!

—উঃ।

—আপনি এত কি ভাবেন?

—কোথায়! কিছু না।

—না ভাবেন না শুধু চুপটি করে বসে থাকেন। বলুন না! এত কি ভাবছেন।

তাহার কথা শেষ না হইতেই তাহার দিদি ঘরে আসিলেন। ইহার পূর্বে তাঁহাকেও সেদিন ক্লাবে দেখিয়াছি। মিঃ দত্ত যেন হাতে চাঁদ পাইয়াছিলেন। এমনই পাগলামি শুরু করিলেন এবং মিসেসও বার বার তাঁহাদের গৃহে যাইবার নেমন্তন্ন করিলেন।

আমার সংকোচ ও সংশয় কাটিয়া গেল।

তিনি কহিলেন,—তোমার নাম কি ভাই?

আমি বলিলাম,—শ্রীরঞ্জনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

—সবাই তোমাকে মাষ্টারবাবু বলে। আমি তোমাকে রঞ্জত বলেই ডাকবো।

—আমার দিদি ডাকতেন 'রাজু' নামে।

—তোমার দিদি! কোথায় তিনি?

—তিনি নেই।

আর্দ্র স্বরে তাহা মিথ্যাকথা বলিলাম, না অভিনয় করিলাম তাহা টের পাইলাম না। যদিও ডলি বিশেষ করিয়াই ধরিয়াছে; তবুও তাহার হাজার কোটি অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি কিন্তু তাহার দিদির অনুরোধ ঠেলিতে পারিলাম না। আমার অভিনয়ে কাজ হইল। তিনি আমাকে স্নেহের বন্ধনে টানিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পীড়াপীড়িতে অবশেষে একদিন সাহুজীর আশ্রয় হইতে কাঁঠালগুড়িতে আসিয়া উঠিলাম। সাহুজী বাধিত হইলেন। বানারহাট রেল ষ্টেশনে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। সহায়হীন চাকুরী অনুসন্ধী জানিয়া তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় স্থান দিয়াছিলেন। আমাদের জীবনে স্নেহ নাই, সৌন্দর্য বলিয়াও কিছু নাই। লক্ষ্যের সন্ধানে অগ্রসর হইবার পথে সাহুজীর বাসা হইতে কাঁঠালগুড়ি চা বাগান আমার নিকট বেশী আশাপ্রদ ছিল। চামুর্চি বাজার কাঁঠালগুড়ি চা বাগান হইতে খুব বেশী দূরে নহে। ইহার মধ্যে কয়েক দিন চামুর্চি বাজারে গিয়াছি এবং হাটের দিন সাধন সেনের সহিত সাক্ষাৎও হইয়াছে। সাধন সেন বলিয়াছে যেরূপ করিয়া হউক চামুর্চি বাজারে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মোহন সিং এখানে আসিয়াছে। তবুও কেন যেন সাহুজীর জন্য মায়া হইল। তাঁহার নিকট বহুবার কথা দিলাম তিনি খবর পাঠাইলেই তাঁহার বাসায় যাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জলপাইগুড়ি সহর হইতে আই, বি অফিসের সম্মুখের পথ ধরিয়া তিস্তা নদী পাড় হইলাম এবং ময়নাগুড়ি ষ্টেশনে আসিয়া ছোট ট্রেনে উঠিলাম। মালবাজারে বসন্ত চৌধুরী নির্দেশ দিয়া গেল, বানারহাট ষ্টেশনে নামিয়া আমাকে চামুর্চি বাজারে আশ্রয় সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার নিকট হইতে আরও নির্দেশ জানিতে পারিলাম বিপ্লবীদের কেহ কেহ আসিলে তাহাদের আশ্রয় সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। সাহুজীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাঁঠালগুড়ি চা বাগানে মিঃ দত্তের বাসায় আশ্রয় গ্রহণে আমি চামুর্চি বাজারের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়াছি সত্য, কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে একটা নতুন আশ্রয় চামুর্চি বাজারেই সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ আশ্রয় আমি এখন কোথায় পাইতেছি। কে আমার জন্য আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে। আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আমার দিনগুলি উদ্বিগ্নতার মধ্যে কাটিতে লাগিল।

সেদিন সকালে লেপের তলায় শুইয়া এই কথাই ভাবিতেছিলাম। কখন বেলা বাড়িয়া গিয়াছে টের পাই নাই। পাশের জানালা দিয়া রৌদ্রের একটা অস্পষ্ট চিকনাই ঘরের মেঝেতে আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে। সেইদিকে লক্ষ্য পড়িতেই উঠিয়া বসিলাম। ডলি যেন আমার নিদ্রা ভংগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে ঘরে আসিয়া আমার চৌকির উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল,

—তোমাকে ওখানে যেতে দেব না।

—কোথায়? সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম।

—ঐ হারামজাদীর চুলোয়।

—ছিঃ ডলি।

—কি আস্পর্ধা বেটির! বলে কিনা ডবল মাইনে দেবে।

—আঃ কিছুই বুঝতে পারছি না তো। বলো কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি···আমি কিচ্ছু জানিনা।

এক নিঃশ্বাসে রুদ্ধস্বরে এই কথা বলিয়াই সে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম।

কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ডলি এ কি ভাষায় কথা কহিল এবং কাহার উদ্দেশ্যে যে এরূপ ইতর বিশেষণ প্রয়োগ করিল উহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিলাম না। শুধু অনুভব করিলাম—একটা দুর্বলতার স্পষ্ট আভাস সে রাখিয়া গেল।

আমার সাড়া পাইয়া গৃহভৃত্য কানাইয়া চায়ের পাত্র লইয়া ঘরে আসিল আমি লেপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া যেটুকু শিখিয়াছি চা বাগানের কুলি ভাষার সহিত বাঙলা মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইরে কে এসেছেরে?

সে তাহার মাতৃভাষায় বলিল, কেউ না।

—আচ্ছা তুই এখন যা।

—মামাবাবু।

—কি রে?

—ছোট দিদিমণি কাঁদছে।

—কোথায়?

—বাইরে।

—আচ্ছা ঠিক আছে তুই যা।

কানাইয়া চলিয়া গেল। চা পান শেষ করিলাম। বহু সময় পরে ডলি ঘরে আসিল। ঘরের অপর পাশে অর্থাৎ আমাকে পিছন করিয়া সে দাঁড়াইল।

আমি ডাকিলাম, ডলি।

সে সাড়া দিল না।

আমি বিছানা হইতে নামিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইলাম। সে

হঠাৎ পিছনে ঘুরিয়া ছুটিয়া আমার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। দেখিলাম তাহার চোখে অশ্রুবন্যা বহিতেছে।

আমার সম্পর্কের হিসাব ভুল হইয়া গেল। মাত্র কয়েকটি দিনের পরিচয়। কলেজের ছুটির অবকাশে সে কোচবিহার হইতে চা বাগানে দিদির বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। আমি তাহাদের আশ্রিত। আমার পরিচয় তাহারা জানে না এবং যে নাম ও পদবী বানাইয়া বলিয়াছি উহার কিছুমাত্র সত্য নহে। চা বাগানের সরল মানুষ—দুনিয়ার কোন খবরও রাখিকরি তাহারা রাখেনা। জানেনা ফাঁসি কাঠের আসামী এক রাজদ্রোহী যুবক তাহাদের সরলতার সুযোগ লইয়া ফেরার জীবন তাহাদেরই ঘরে কাটাইতেছে। আমি ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। ইতিমধ্যে ডলি নিজেকে সামলাইয়া নিয়াছিল। তবুও সে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কহিল,

—সেদিন যদি তুমি আমার ভুল গান গাইতে তবে এত অপমান হ'তনা।

—তোমার অপমান ?

—হাঁ আমার। শুধু আমার নয় দিদি জামাইবাবুরও অপমান।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া গেল না দাঁতে জিহ্বা চাপিল ঠিক বুঝিলাম না। কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া ডলি পুনরায় বলিল,

—কেন গাইলে না সেদিন ? কেন সেদিন হল ভর্তি লোকের সামনে আমাদের মুখে চুনকালি মেখে দিলে না ? আজ টাকার লোভে তুমি তাই করবে।

—টাকার লোভে ?

—নয়ত কি। বেশী টাকা পাবে বলে শেষে কি না···

—শেষে কিনা···, তাহার ছাড়া কথা ধরাইয়া দিলাম।

—তুমি জ্যাকের মাষ্টারী করবে ?

—জ্যাক ! কে সে ?

—কে আবার। সাহেব ম্যানেজারের কেপ্টের ছেলে।

ডলির কথায় আমি স্তম্ভিত হইলাম।

ডলির গণ্ডদেশ অশ্রুবন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। মেয়েদের চোখের জল যে এত তাড়াতাড়ি নামে—এই প্রথম দেখিলাম। ডলির হৃদয়ের এই দুর্বলতা আমার একুশ বছরের জীবনে দুর্বোধ্য। কেবল মনে হইতে লাগিল ডলি পুলিশের আগমন প্রতীক্ষায় ছলনা করিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। ডলি সত্য সত্য কাঁদিতেছে আর আমি যেন তাহাকে কাঁদাইতেছি। মন্দিরের পাষাণ দেবতার সম্মুখে মানুষ যেমন করিয়া কপাল ঠুকিয়া অশ্রুপাত করে, ডলি ঠিক তেমনি করিয়া চোখের জল ফেলিতেছে। এই দৃশ্য হয়ত কোনদিন আমি ভুলিব না। তথাপি এইরূপ অনভ্যস্ত অবস্থার মধ্যে আমি কি করিব সহসা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। একটি মাত্র কাজ জানিতাম এবং তাহাই করিলাম। ডলি অবাক হইল কি হইলনা খেয়াল করিলামনা, দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়িয়া বাসার বাহিরে চলিয়া গেলাম। সারাদিন কেবল ভাবিতে লাগিলাম। ডলির হৃদয়ের দুর্বলতা নদীর স্রোতের মত অকস্মাৎ বাহির হইয়াছে—সে কূল ঠেকাইতে পারে নাই। সে নিজে ভাসিয়াছে এবং আমাকে পর্যন্ত ভাসাইয়া নিতে চলিয়াছে। সে জানে না কি ভয়ংকর আগুন লইয়া খেলা করিতেছে। আমার সমস্ত অন্তঃকরণে বিতৃষ্ণার শেষ ছিল না। সংসারের সাধারণ মানুষের মত আমি এ কি করিতেছি। ডলির জিহ্বায় 'তুমি' সম্বোধন কি করিয়া যে এতক্ষণ সহ্য করিতেছিলাম—ইহা মনে করিয়া আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। অথচ আমি সম্পূর্ণ নিরুপায় মুহূর্তের জন্য কোথাও আত্মপরিচয় প্রদানের উপায় নাই। সাহুজীর বাসায় আর যাহা হউক নিজেকে সম্পূর্ণ একা পাইয়াছিলাম এবং আমাকে লইয়া তাঁহার বাসার কাহারও মাথা ব্যথা ছিল না। সেখানে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে না পারিলে এই চাবাগান মুলুকে আমার যাইবার আর জায়গা নাই। আমার নীরবতায় ডলির হৃদয়তন্ত্রীতে যে দোলা উঠিয়াছে, আর যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইলে এক্ষুণি এই মুহূর্তে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। সাধন সেন ভুটান পাহাড়ে আছে। চামুচি বাজারে মোহন সিং আসিয়াছে।

চামুচি বাজার আমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল তথাপি তখন পর্যন্ত চামুচি বাজার আমার নিকট যেন বহু দূরে ছিল। যখন জানিতে পারিলাম সেই সাহেব ম্যানেজারের রক্ষিতা চামুচি বাজারে বাস করে এবং তাহার বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইতে হইবে, আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম। জানিনা কে সে, জানি না সে কোন সাহেবের রক্ষিতা ইহা বিচারের সময় তখন নহে। চামুচি বাজারে আমার আশ্রয় লাভের এই অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া করিতে পারিব না। ডলি জানে জানুক আমি বেশী টাকার লোভে তাহাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছি, অথবা গোপনে যদি আরও বালতি বালতি চোখের জল ফেলে তবে নির্বিঘ্নে ফেলুক—তাহার সহিত আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। ডলির রূপ আছে কি না জানিনা, পুরুষের চিত্ত আকর্ষণের মত কাঁচা বয়স তাহার আছে। আমি তাহার গানের শিক্ষকতা যেটুকু করিয়াছি তাহার ঢের ঢের বেশী অভিনয় করিয়াছি। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছি—ইহার বেশী কিছুই নহে। আমার এই সামান্য দেহটি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ফাঁসির খাতায় আঁকিয়া দিয়াছি—ইহার উপর ডলির লোলুপতায় আমি লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সহিত মিশিয়া গেলাম। একটি একটি করিয়া ডলির বহু কথা বহু আচরণ আমার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল যেন সেই আদিম যুগের এক বংকাল আমাকে ঘিরিয়া উলংগ নৃত্য করিতেছে। আর একটি মাত্র দিন এখানে এই বাসায় বিলম্ব করিব না। প্রত্যূষে উঠিয়া চামুচি বাজারে সাহেবের রক্ষিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ছেলে পড়াইবার কাজ সংগ্রহ করিব বলিয়া স্থির করিলাম।

আর যাহা হউক ঢের ঢের ছেলে দেখিয়াছি কিন্তু আমার ছাত্র জ্যাকের মত ছেলে ভূ-ভারত কেন বোধকরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছিল না। এইহেন

জ্যাকের গৃহশিক্ষকতার দায়িত্ব কবুল করিয়া চামুর্চি বাজারে তাহাদের বাসায় উঠিয়াছি। এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল তথাপি দশ বৎসরের এই বালককে সামলাইয়া উঠিতে পারিলাম না। তাহাকে বালক বলিতেছি নেহাৎ বয়সের গুজনে। আসলে যে সে কবে বালকত্বের কোঠা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ইহা বোধকরি তাহার গলায় সোনার চেনের সহিত লকেটের মধ্যে গ্রথিত স্বয়ং যীশুখৃষ্টও জানিতেন কি না সন্দেহ হয়। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে বলডুইন সাহেব এই মূল্যবান উপহারটি প্রিয়তম জ্যাকের কণ্ঠে স্বহস্তে পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রথম যেদিন এই বাসায় আসিলাম তখনকার নূতন চালু আমার পকেটের গোটা সাতেক এক টাকার নোট উধাও হইল। আমি সর্বস্বান্ত হইলাম। শ্রীমান জ্যাক সেদিনই দুপুরে ভুটান পাহাড়ে ভুটানের হাটে বেড়াইতে বেড়াইতে লইয়া গেল। তারপর দেখিলাম আমারই সম্মুখে সে ভুটিয়াদের সহিত আমার সেই এক টাকার নোটগুলি চিড়াতন হরতনের পানের উপর রাখিয়া দিব্যি জুয়ার দান ধরিতে লাগিল। এই আমার ছাত্র জ্যাক।

উত্তর বংগের জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট হইতে প্রধান সড়কটি বহু চা বাগানের ভিতর দিয়া চামুর্চি চা বাগানের প্রধান ফটক পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। সড়কের শেষ মাথায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের রিজার্ভ ফোর্সের ছাউনী। কাঁটা তারের ভিতর কাঠের ঘরের ব্যারাক, উহার সম্মুখ ভাগে চামুর্চি বাজার। বাজারের শেষে বাঁশবাড়ীর পরে নদী এবং উহার পরেই ভুটান রাজ্য আরম্ভ। নদী পাড় হইয়া কাজি সাহেবের বাড়ীর অনতিদূরে ভুটানের হাট। সপ্তাহের একটি দিন হাট বসে। কোন স্থায়ী দোকান এখানে নাই। চামুর্চি বাজারে সপ্তাহে একদিন হাট বসে এবং বহু স্থায়ী দোকান এখানে আছে। চামুর্চির আশে পাশের চা-বাগানের কর্মচারীদের হাটে কেনাকাটা ছাড়াও

পাহাড় হইতে ভুটিয়ারা সওদা লইয়া আসে। তাহারা সওদা বিক্রয় করে। বহু জিনিস তাহারা খরিদ করে এবং ভাটিখানার পিপা পিপা মদ নিঃশেষ করিয়া পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। জলপাইগুড়ি সহরে লামা, ভুটিয়া, নেপালী পাহাড় দেশের মানুষ দেখিয়াছি। তাহাদের নিজেদের দেশে তাহাদিগকে এই নূতন দেখিলাম। কি পুরুষ কি নারী সকলের প্রায় এক ধরনের পোষাক। তাহারা নিয়মিত স্নান করে না বিশ্রী ভোট্‌কা গন্ধ লইয়া বেড়ায়। আমি তাহাদের কথা বুঝি না। কিন্তু আমার ছাত্র জ্যাক সমানে তাহাদের ভাষায় কথা কহিয়া দানের পর দান জুয়া খেলিতে লাগিল। সে ক্রমাগত হারিতেছিল, জিতিতেও হইতেছিল। এক সময় সবিস্ময়ে দেখিলাম সে প্যান্টের পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দিব্যি জ্বালাইয়া লইল। আমাকে সে ভ্রুক্ষেপ করিল না। এই বালকের বিচারে আমি হেন বাঙালীকে কেয়ার করিবার আবশ্যকও তাহার ছিল না।

কি একটা জন্তুকে পিটাইয়া মানুষ করিবার কথা পূর্বে শুনিয়াছি। স্বয়ং চানক্য পণ্ডিত আবার কোন কোন বিশেষ জীবজন্তু ও পক্ষীর নিকট হইতে ইহাদের স্বভাব শিখিবার উপদেশ মনুষ্যকুলের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ জ্যাককে ইংরাজী শিখাইয়া মানুষ করিবার পরিবর্তে যদি এই বালকের দশম বিদ্যার কোন একটির উত্তরাধিকারী হতে পারিতাম তবে···। থাক্ সে কথা। আমার প্রাণাধিক ছাত্রের নিন্দা করিবনা। ইংরাজ কোম্পানীর চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ বলডুইন সাহেবের ঔরসজাত মাষ্টার জ্যাককে ঠিক ইংরাজসাহেবের মত ইংরাজী শিখাইবার প্রতিশ্রুতি তাহার গর্ভধারিণী বুলাবিবিকে দিয়াছি। বুলাবিবি চাংচুরির বাজার কেন বানারাহাট সার্কেলের সুপরিচিতা। যতদিন মিঃ বলডুইন বাগানে ছিলেন বুলাবিবি তাহার কোয়ার্টারের সংলগ্ন একটি বাসায় পুরাদস্তুর সাহেবী কায়দায়

ছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে শ্বেতাংগ সাহেব চলিয়া গেলে বুলাবিবিকে চা-বাগানের ভিতর রাখিবার দায়িত্ব বাঙালী ম্যানেজার রখিলেন না। শেষ পর্যন্ত বুলাকে চামুর্চি বাজারের এই বাসা ভাড়া করিয়া উঠিয়া আসিতে হইয়াছে। চা বাগান হইতে বাহির হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে নাকি জ্যাক ইংরাজী কথা ভুলিয়া যাইতেছে। বুলা হিন্দী বাঙলা মিশাইয়া কথা বলে, ইংরাজী বলিতে পারে না। মিঃ বলডুইন চমৎকার হিন্দী জানিতেন। তাহার বড় আশা ছিল জ্যাক তাহার মত ইংরাজী শিখিবে, বলিবে। আমার কথা বুলা পূর্বে শুনিয়াছে এবং মিঃ নন্দীর পরামর্শে আমাকে জ্যাকের মাষ্টার নিযুক্তের প্রস্তাব কাঁঠালগুড়ির মিঃ দত্তের নিকট উপস্থিত করিয়াছে।

মাড়োয়ারীবাবুদের বাসার পিছনে বড় বড় শালের খুঁটির মাথায় এই বাসা। পাহাড়ের নিকট বলিয়া এই স্থানে বাড়ীঘর সব একই ধরনের। কয়েকটি কাঠের সিঁড়ি ডিংগাইয়া এক ছটাক রেলিং ঘেরা নামমাত্র বারান্দার পরে প্রথম দরজাতেই আমার ঠাঁই। বাম পাশের ঘরে কর্ত্রী বুলাবিবি থাকে। আমার আস্তানার পিছনের কাঠের দেওয়ালে একটি দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, এই ঘরে জ্যাক ও তাহার মাসী থাকে। এই বাসার তৃতীয় প্রাণী বাঁধে—ছোকরা চাকর। ছেলেটি বেশ চটপটে। নামে, কথায় উত্তর বংগের বাহে বলিয়া টের পাওয়া যায়। তাহার হাত দিয়াই জ্যাকের মাসী আমার যত্ন তদারক করিত। ঘরের দরজা খুলিলেই ধূসর পাহাড় দেখা যায়—ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি অপলক দৃষ্টি মেলিয়া পাহাড় দেখিতাম। যেদিন সূর্যদেব উঠিতেন ধূসর পাহাড়ের বুকে হলুদ বর্ণের চাদর দেখা যাইত, কে যেন রৌদ্রে মেলিয়া দিয়াছে। ইহা চাদর নহে ফসলের ক্ষেত। পাহাড়ের বুকে মনুষ্যবসতির সন্ধান পাইতাম। মনে হইত ঐ পাহাড় যেন আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। আকাশের কোলে পাহাড় ঘুমাইয়া থাকিত। ঐ পাহাড় ডিংগাইয়া আমরা স্বদেশভূমি ত্যাগ করিয়া যাইব —শিকলে বাঁধা পশুর মত ফাঁসির দড়িতে মৃত্যু অপেক্ষা যদি পাহাড়ের বুকে শেষ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহাতেও শান্তি।

পরাজয়ের গ্লানি নাই। শত্রুর হাতে নির্যাতন নাই। কতক্ষণ কি ভাবিতেছিলাম খেয়াল নাই। বাফৈয়ের কণ্ঠস্বরে চমক ভাংগিল। সকালে জ্যাক তাহার মাতার সহিত বানারহাটে গিয়াছে। তাহাদের ফিরিতে দুপুর হইবে। এই অবকাশটুকু বারান্দায় বসিয়া পাহাড় দেখিয়া কাটাইতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম। আরও ভাবিতেছিলাম আমাদের বিদেশ যাত্রার পূর্বে গভর্ণমেণ্ট ফোর্সের ব্যারাক অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বেশ কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাবটি যে কি করিয়া চন্দননগরে বিজলীদার নিকট পাঠান যায় তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। বাফৈ কখন ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছিল কাঠের পাটাতনের উপর তাহার পায়ের শব্দেও টের পাই নাই।

সে ডাকিল, মাষ্টারবাবু।

সাড়া দিলাম, উঁ।

—এ বেলা কি খাবেন?

—যা হয়। ভাত না হ'লে রুটি।

—ছোট মেমসাব বলছে···

তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই পিছনে মুখ ঘুরাইয়া দেখিলাম কাঞ্চীরানী। এই কয়েক দিনের মধ্যে এত কাছে এত স্পষ্ট করিয়া তাহাকে দেখি নাই। না, ঠিকই সে নেপালী তরুণী, শুধু শাড়িখানা বাঙালীর মত। বুলাবিবি একটু বেশী মোটা, কাঞ্চীরানী মাঝারি। উভয়েই বেশভূষায় পরিপাটি, কানে কিংবা গলায় তাহাদের জাতীয় অলংকার নাই। হাতে চিকন কাঁচের চুড়ি, আঙুলে সোনার আংটি। কাঞ্চীরানীর রং ফর্সা। গালের নীচে একবিন্দু কালো তিল এক নজরে চোখে পড়ে।

কাঞ্চীরানী আমার কৌতূহলী দৃষ্টিতে অপ্রতিভ হইল এবং সলজ্জ মুখখানা গোপন করিতে চাহিল, পারিল না।

বাফৈ বলিল—কি বলবে এই বেলা বলো মেমসাব।

আমি পুনরায় কাঞ্চীরানীকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিলাম। আঠের কি কুড়ি ইহার বেশী বয়স তাহার নিশ্চয়ই নহে। স্থির, নম্র

তাহার দৃষ্টি। বেশ লজ্জিত কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় ধীরে ধীরে বলিল, আপনি এখানে কেন এসেছেন ?

তাহার কথায় আমি শুধু অপ্রস্তুতই হইলাম না, চমকিয়া উঠিলাম। জবাব দিলাম না। বেশ কিছু সময় নীরবে কাটিয়া গেল। কাঞ্চীরানী পুনরায় বলিল, এখানে আপনার আসা ঠিক হয়নি।

আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিল এবং সে পুনরায় বলিল, চেষ্টা করবেন যাতে···, এই পর্যন্ত শব্দ তাহার মুখ হইতে শুনিতে পাইলাম। পরমুহূর্তে দেখিলাম সে ঘরের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পায়ের শব্দ কাঠের মেঝের উপর আর থাকিল না।

বুলাবিবির এই বাসায় আমার আশ্রয় যে খুব সুখের ছিল তাহা বলিব না। চা-বাগানের বাবুদের বাসায় আমার খানের নিমন্ত্রণ কমিতেছিল। সাহেবী একবারও দেখা করিতে আসিলেন না অথবা তাহার বাসায় যাইবার অনুরোধও জানাইলেন না। বাজারের দর্জি রণজিতবাবুর সহিত যেটুকু আলাপ পরিচয় ইতিমধ্যে হইয়াছিল, তিনি একবার নহে অনেকবার আভাস ইংগিতে আমার চাকুরি ও অন্নদাত্রীর প্রতি কটু বিরূপতা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু আমার হিসাব ছিল আলাদা। সংসারের রুচি অথবা শালীনতার ধার আমরা ধারিতাম না। বুলাবিবির বাসার মত নিরাপদ ছাওয়া চারুচি বাজারে দ্বিতীয়টি ছিল না। গভর্নমেন্টের গোয়েন্দাদের নজর আর যেখানে পড়ুক মিঃ গলডুইনের রক্ষিতার বাসায় যে পড়িবেনা নিশ্চিত ছিলাম। জ্যাকের মাষ্টারিগিরি আমার নিকট কুইনিনের পিলের মত ছিল। লক্ষ্য করিলাম কাঞ্চীরানীর শেষ কথা শুনিয়া বাবৈ পর্যন্ত ফিক্ করিয়া হাসিয়া কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কাঞ্চীরানীর কথাগুলি আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। তাহার কথার ধরন দেখিয়া মনে হইতেছিল সে বুঝি আমার কেরারী জীবন টের পাইয়াছে। একটু পরে বাবৈ যখন বাসায় উঠিতেছিল, আমি নীচে নামিয়া তাহাকে রাস্তার উপর ধরিলাম। বাবৈকে একটু দূরে টানিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছেরে বাবৈ ?

বাঁফৈ সবিস্ময়ে কহিল, কি জানি মাষ্টারবাবু। ছোট মেমসাব দু'দিন ধরে আপনাকে কি বলবেন বলবেন করছিল।

—চলে যেতে বলছে কেন?

—আমি জানি না মাষ্টারবাবু। দিব্যি করে বলছি জানি না। আর ছোট মেমসাহেবের কথায় আপনি চলে যাবেন কেন?

—আঃ সে কথা নয় বাঁফৈ। সত্যি করে বল্ কিছু শুকুসনি আমাকে চলে যেতে বলছে কেন?

—বিশ্বাস করুন মাষ্টারবাবু আমি জানি না। ছোট মেমসাব বললে কি হ'বে বড়মেমসাব আপনাকে ছাড়বে না। কত চেষ্টা করেই না আপনাকে পেয়েছে।

—এর আগে কি মাষ্টার ছিল না?

—কার এত বাপমায়ের ঠেকা যে ঐ বেজম্মাষ্টার পড়ার ভার নেবে। ওটা একটা আস্ত জন্তু।

তার কথায় বুঝিতে পারিলাম জ্যাককে সে দুই চক্ষে সহ্য করিতে পারে না। বাঁফৈ পুনরায় বলিল, একজন মাষ্টার ছিল।

—তারপর, বাঁফৈ?

—দু'দিন থেকে কেটে পড়ল।

—কেন?

—বেজম্মা জ্যাক কি কম চিজ মাষ্টারবাবু। বলে কি না.....প্রাণাধিক ছাত্রের নিন্দা স্বকর্ণে শুনিবার পূর্বে তাহাকে থামাইয়া দিলাম।

বলিলাম, থাক থাক হয়েছে। তুই যা।

বাঁফৈ কাঠের সিঁড়ি কয়েক লাফে ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। দূর হইতে দেখিলাম। তাহার নিকট হইতে তেমন কিছু জানিতে পারিলাম না। কাশ্মীরানীর শেষ কথা তখন পর্যন্ত আমার কানে বাজিতেছিল।

আমি রাস্তার কলের জলে স্নান করিয়া দুপুরে ঘরে আসিলাম। বেশ শীত করিতেছিল। বাঁফৈ আমার খাবার আনিয়া দিত। সেদিন

অপ্রস্তুত ও আশ্চর্য হইলাম। দেখিলাম কাঞ্চীরানী থাবারের ডিস লইয়া ঘরে আসিল। সে সযত্নে মাংস ও কোয়াশ ডালনার বাটি নামাইয়া রুটির উপর ঘি মাখাইতে লাগিল। আমি সংকোচ বোধ করিতেছিলাম। বাঁফে জলের গ্লাস হাতে করিয়া ঘরে আসিল।

সে বলিল, মাষ্টারবাবু বসুন।

কাঞ্চীরানী উঠিয়া দরজায় পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইল।

আমি আহারে বসিলাম।

বাঁফে চলিয়া গিয়াছিল। আমি কাঞ্চীরানীর দিকে না চাহিয়া বলিলাম, আপনি সুন্দর বাংলা বলতে পারেন।

আমার কথায় কাঞ্চীরানী খুশী হইল, তাহার কথায় বুঝিতে পারিলাম।

সে বলিল, লিখতেও পারি।

—বাঃ! শিখলেন কোথায়?

—দার্জিলিংয়ে সাহেবের বাড়ীতে।

—য়্যা! সাহেব বাড়ী?

—নামে সাহেব। আসলে বাঙালী।

—সেখানে কি করতেন?

হঠাৎ অহেতুক প্রশ্ন করিলাম। কাঞ্চীরানী এই প্রশ্নের জবাব দিল। না দিলেও পারিত। সে বলিল, ছেলেমেয়ে রাখতাম।

—ও বুঝেছি। আমি বলিলাম।

সে বলিতে লাগিল, আমার বয়সী একটি মেয়ে ছিল। তার নাম প্রতিমা। তার কাছ থেকে আমি বাংলা শিখেছি।

সোৎসাহে আমি কহিলাম, খুব ভাল। ইংরাজী?

—কিছু কিছু জানি। নাম লিখতে পারি। আচ্ছা মাষ্টারবাবু···।

—বলুন।

—আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন?

—মা আছেন। আর একটি ছোট্ট ভাই।

—পিতাজী?

—না। তিনি বহুদিন চলে গেছেন।

একটির পর একটি অজস্র মিথ্যাকথা আমার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল।

—আপনার মা আপনাকে বিদেশে পাঠালেন কেন?

—চাকরি করতে।

—এই কি আপনার চাকরি! চা-বাগানে এলেন কেন?

—দেশে শুনেছি চা-বাগানে লোকের অভাব। ওখানে গেলেই কাজ জুটে যায়।

—আপনার দেশ কোথায়?

—চব্বিশ পরগনা জেলার হালিসহরে।

—কলকাতার কত দূর?

—কাঁচরাপাড়া নৈহাটির মাঝখানে। কলকাতা থেকে মাইল পঁচিশ ত্রিশ হবে।

—কলকাতায় কাজ পেলেন না?

—চেষ্টা করেছি। পেলে নিশ্চয় আসতাম না। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে গেলাম।

মিথ্যা কথায় জড়াইয়া পড়িতেছি, টের পাইলাম। কাঞ্চীরানী খাবারের ডিসের উপর আমার নত মুখ দেখিতে পাইতেছিল কি না জানিনা। তাহার কথায় কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। আমার কথা শুনিয়া সে কহিল, ঘুরতে ঘুরতে কেন?

—কেন আবার? আমার এক মামা থাকেন জলপাইতে। তাঁর বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম।

—তারপর?

—তারপর চলে এলাম চা-বাগানে। বানারহাট, কাঁঠালগুড়ি থেকে এখানে এসে উঠেছি। একটা ভাল কাজ জুটে গেলে আর দেশে ফিরে যাব না।

—সেই চেষ্টা করুন যাতে ভাল চাকরি হয়।

—চেষ্টার কসুর করছি না। পেলেই চলে যাব।

—না···না···আমি আপনাকে চলে যেতে বলছি না। আপনি এখানে

থাকবেন এ ত আনন্দের কথা। এই বলিয়া কাঞ্চীরানী ভিতরে চলিয়া গেল।

এইটুকু তখন উপলব্ধি করিতে পারিলাম—সে যেন কি একটা কথা বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারিতেছে না। কাঞ্চীরানী দার্জিলিংয়ের জানি না কোন্ বাঙালী বাড়ীর আয়া ছিল। মনে হইতেছিল সে শুধু বাঙালী পরিবারের মেয়ের মত কথা বলিতেই শিখে নাই, তাহার ব্যবহারে রুচি ও ভদ্রতার পরিচয় রাখিয়া গেল।

বুলাবিবির সহিত কাঞ্চীরানীর অনেক পার্থক্য দেখিতে পাইলাম। আমার মনের কোণে যে আশংকা আনাগোনা করিতেছিল—উহার কিছুটা কাটিয়া গেল।

কোথায় মালয়—আর কোথায় কোন্ রবার বনের নীচে তাঁবু, আর কোথায় ভূটান পাহাড়ের পাদদেশে চা-বাগানের কাঠের ঘর ; এই বিরাট দূরত্ব দুইটি প্রাণে দূরত্বই নহে, ব্যবধানও নহে। মিঃ বলডুইনকে আমি দেখি নাই। শ্বেতাংগদের প্রতি আমার তখন যে ক্রোধ ছিল, ভিতরে ভিতরে বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছিল কিন্তু মিঃ বলডুইনের প্রতি তবুও যেন একটু মায়া হইল। তাহার চিঠি পড়িতেছিলাম। গৃহকর্ত্রী বুলাবিবি নিজে আমাকে তাহার ঘরে ডাকিয়া আনিল। কাঠের বাড়ীর মাঝারি ধরনের ঘর। সাহেবী কায়দায় সুসজ্জিত। বেতের সোফা হইতে মাতা মেরী ও যীশুর বড় বড় ছবি পর্যন্ত ঘরে আছে। আমি সোফায় বসিলাম। একটা ছোট বেতের টেবিল বুলাবিবি নিজের হাতে তুলিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল এবং একটা মোটা কাঁচের ঢাদর টেবিলের উপর পাতিয়া দিল। ঘরের দুই দিকের দুইটি দরজা বন্ধ করিয়া সে আমার মুখোমুখি টেবিলের আর এক পাশে আর একটি সোফায় বসিল। আমি বিস্মিত হইলাম। মনে হইল যেন জংগলের বুনো ফুল ঘরে আনিয়া বুলাবিবি যত্ন করিতেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে আমার বিস্ময় কাটিল। বুলাবিবির এই হেন আদরের কারণ বুঝিলাম।

বুলাবিবি একখানা মুখআঁটা বড় খাম টেবিলের কাঁচের উপর রাখিয়া হিন্দিতে বলিল, এটা খুলে পড়ুন মাষ্টারসাব।

আমি খামটি হাতে তুলিয়া দেখিলাম দেশ বিদেশের ডাকঘরের সিলমোহরাংকিত এয়ার মেল লেটার। ডাক টিকিট নাই। 'সাভিস' শব্দটি বড় টাইপে ছাপা রহিয়াছে। চিঠির মুখ ছিঁড়িয়া খুলিলাম।

সর্বনাশ! চিঠির প্যাডের আটটি পাতার উভয় পিঠে ইংরাজী বর্ণমালার

ক্যাপিটাল লেটারে ঠাসা বুনোটে ভর্তি। আমার ভ্রম কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দূর হইল। ইংরাজী অক্ষরের হস্তলিপি কিন্তু ভাষা হিন্দি। আমি পাঠ সুরু করিলাম। বুলাবিবি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে একবার চোখাচোখি হইতেই দেখিলাম বুলাবিবি ঈষৎ হাস্তমাখা ঠোঁট দুইটি দাঁতে চাপিয়া ধরিল।

সাহেব মালয় দেশের বিচিত্র খবর দিয়াছে। এবং সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এখানে বুলা তাহার পাশে থাকিলে উপভোগের মাত্রা ঢের ঢের বেশী বৃদ্ধি পাইত। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমার বানান করা ছাড়া ছাড়া শব্দে চিঠির পাঠ বন্ধ হইল। বুলাবিবি কহিল, আচ্ছা এখন থাক্। কাল চিঠির জবাব লেখা যাবে।

আমি উঠিতেছিলাম। বুলাবিবি বাধা দিল, কহিল, বুঝেছ মাষ্টার! সাহেব আদমী! বহুৎ আচ্ছা করে মাথা খাটিয়ে জবাব লিখে দিবে।

—আমি লিখব?

—হ্যাঁ।

—আমাকে মাপ করুন।

—ধ্যেৎ। আমি বলবো তুমি লিখবে। তুমি চিঠি লেখ না?

—এমন চিঠি কোনদিন লিখিনি।

—অবাক করলে। তোমরা বাঙালী জোয়ান কলেজে পয়লাতেই চিঠি লিখতে শিখ।

বুলাবিবির কথায় আমার সর্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে আমার অন্নদাত্রী। আমি ক্রোধ গোপন করিতে পারিলাম না। রুঢ় স্বরে বলিলাম, আশাকরি আমাকে দেখে আপনার ভুল ধারণা ভাঙবে।

—তুমি গোঁসা করলে মাষ্টার?

এই বলিয়া বুলাবিবি একটু থামিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, সত্যি যদি চিঠি লিখতে না শিখে থাক তবে এই বুলার কাছে শিখে নিও।

না, বুলাবিবি বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি করে নাই। কি করিয়া চিঠি লিখিতে হয় যথার্থই এই পাহাড়ী যুবতীর নিকট শিখিতে হয়

সকালে চায়ের পেয়ালায় মুখ দিতেই গৃহকর্ত্রী বুলার ঘরে ডাক পড়িল। গদিআঁটা সিংগল বেডে লেপের ভিতর হইতে শুধুমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া আমাকে তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিতে বলিল। বসিলাম।

বুলাবিবি হাঁক ছাড়িয়া ভৃত্য বাঁকেকে ডাকিল এবং বাঁফে ঘরে প্রবেশ করিল। গৃহকর্ত্রীর নির্দেশে বাঁফে বেতের টেবিল, চিঠির প্যাড খাম ও কলম আনিয়া দিল। সোনার পার্কার পেন এই প্রথম দেখিলাম। আমার চক্ষু হুল হুল করিয়া উঠিল কি না বলিতে পারিনা—তবে ঐ পেনে লিখিবার উৎসাহ আমার বাড়িয়া গেল।

বুলাবিবি বলিল, সুন্দর করে 'চিট্টি' লিখবে। নাও তার আগে মাথা সাফ্ করে নাও।

—মাপ করবেন।

—তুমি দেখছি বড্ড ছেলেমানুষ, এই বলিয়া আমার গভীর বিস্ময়াভিভূত চক্ষুর সম্মুখে বুলাবিবি রূপার কেস্ খুট করিয়া খুলিয়া সিগারেট বাহির করিল এবং তাহার দুই ঠোঁটের ফাঁকে চাপিয়া ধরিল। লাইটারের বোতাম টিপিয়া সিগারেট জ্বালিল। এক গাল ধোঁয়া নিক্ষেপ করিল। মশারীর একদিক উঁচু ছিল। ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল। আমার পিছনে খোলা জানালার ভিতর দিয়া আসা সামান্য আলোতে প্যাড খুলিয়া ধরিলাম।

বুলাবিবি বলিল, প্রথমে লেখ 'মাঈ হানি'।

সাহেবের চিঠির অনুকরণ বলিয়াই My Honey শব্দটি বুঝিতে পারিলাম নচেৎ বুলার উচ্চারণে ধরিতে পারিতাম না।

—তারপর লিখ ·।

—ইংরাজী না হিন্দিতে লিখবো ?

—তুমি আস্ত বোকা। সাহেবের মত লিখবে, ঠিক যেমনটি বলছি।

একে বুলার হিন্দি শুদ্ধ নহে, তাহার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট নহে—আমি সমস্যায় পড়িলাম, এই তাহার হিন্দিবাত ইংরাজী অক্ষরে লিখিতে হইবে।

লিখিতে লাগিলাম। বিরহিণীর অন্তরে যত আবেগ আছে বুলাবিবি উজাড় করিয়া দিল, আমি কয়েক পৃষ্ঠা ভরিয়া লিখিলাম। একই কথা সে বার বার ব্যক্ত করিতেছে, সে শুধু বলডুইনের এবং বলডুইনেরই থাকিবে। তারপর আসিল জ্যাকের কথা। জ্যাকের জন্য নূতন মাষ্টার আসিয়াছে। জ্যাক খুব লেখাপড়া শিখিয়াছে। পড়ায় জ্যাকের খুব উৎসাহ। আর কিছুদিনের মধ্যেই জ্যাক স্বহস্তে চিঠি লিখিবে। এখানে জিনিসপত্রের ভীষণ দাম বাড়িতেছে। ব্যাঙ্কের টাকায় বুলার কোনমতে চলিতেছে।

—বুঝলে মাষ্টার!

বুলাবিবির কথায় কলম থামাইলাম।

সে বলিল, একটু চা খাও।

—এত বেলায়!

—ক'টা বাজলো?

—প্রায় এগারটা।

—আর একটু লিখতে হবে।

—বেশ বলুন।

—বুঝলে মাষ্টার এমন মানুষ আর হয় না। ব্যাঙ্কে বলে গেল ফি মাসের পয়লাতে পাঁচশ' করে রূপেয়া আমাকে পাঠাবে।

—পাঁ···চ···শ'

আমি সশব্দে আৎকে উঠিলাম।

—ধোৎ পাঁচশ' রূপেয়ায় আমার কি হ'বে।

তাহার কথায় আমি আরও অবাক হইলাম।

—জ্যাকের খরচার জন্য আরো দু'শ রূপেয়া ব্যাঙ্ককে দেবার জন্য সাহেবের হুকুম পাঠাতে লেখ।

—বেশ বলুন।

—মাষ্টার, তুমি যদি সাহেবকে একবার দেখতে—কি সুন্দর, ভেরি সুইট্।

—আপনাকে খুব ভালবাসেন···

—খুব ভালবাসেন মানে, আমার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বুলাবিবি

বলিতে লাগিল, আরে আমিই যে সাহেবের সব। আমার জন্য সে কি না করেছে।

—শুনুন।

আমি ভীত হইয়াছিলাম। আশংকা করিতেছিলাম বুলাবিবি তাহার স্মৃতির বোঝা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিবে। সে আমার দিকে চাহিল। আমি সবিনয়ে বলিলাম, ও সব কথা থাক্।

—তাইত তোমাকে শোনাচ্ছি কেন। এই বাফৈ···।

—মেমসাব, বলিয়া ছুটিয়া বাফৈ ঘরে আসিল।

—কফি লে-আও।

নিমেষের মধ্যে বাফৈ অদৃশ্য হইল।

—শোন মাষ্টার। আমার জন্যই সাহেব কলকাতার অফিস ছেড়ে চা-বাগানে এলো।

—আমি উঠি।

—আঃ তুমি জ্বালালে মাষ্টার।

—চিঠিতে আর কি লিখবো।

—বলছি। আচ্ছা মাষ্টার, সত্যি বলোত তোমরা পুরুষেরা এত বোকা কেন?

—বোকা! বোধকরি ওটা স্বভাব।

—ছাই জানো। জেনানাদের রূপ দেখে পুরুষ আদমী বোকা বনে যায়।

আমি লজ্জায় মাথা আরও নীচু করিলাম।

বুলাবিবি হঠাৎ প্রশ্ন করিল, প্রেম করেছ?

আমার অদৃষ্টকে শতবার ধিক্। সম্পূর্ণ অপরিচিতা অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের নিকট এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। আমার নিরুত্তরে সে কি বুঝিল জানিনা। সে কহিল, প্রেম করেছ কি মরেছ।

আমি মনে মনে বলিলাম ফাঁসির কাঠ ত মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

—আচ্ছা মাষ্টার!

—বলুন।

—বাঙালী মেয়েরা প্রেম করে কাঁদে কেন ?

—বোধকরি সত্যি ভালবাসে বলে।

—তোমার মুণ্ডু। আসলে ওরা প্রেম করতেই জানেনা তাই কাঁদে।

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বে বাইজি কাফির পাত্র লইয়া ঘরে আসিল। বুলাবিবি চতুর্থ সিগারেটের পর পঞ্চম সিগারেট জ্বালাইয়া লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া উঠিয়া বসিল, আমি মুহূর্তের মধ্যে মুখ ঘুরাইয়া নিলাম।

বলডুইন সাহেবের আদেশে চা-বাগানের অফিসবাবু জ্যাককে কিছুটা ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন। আমি এক পক্ষকালের চেষ্টাতেও তাহাকে গ্রামারে প্রবেশ করাইতে পারিলাম না। জ্যাককে লেখাপড়া শিখাইতে না পারিলেও তাহার গর্ভধারিণী আমার চিঠি লিখিবার প্রশংসা সগৌরবে জাহির করিতে লাগিল। এতদিন ঠিকাদার মুখার্জীসাহেবের অনুগ্রহের উপর বুলাবিবি মন খুলিয়া সাহেবের নিকট চিঠি লিখিতে পারে নাই বলিয়া খেদ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমার আদর বাড়িয়া গেল। বুলাবিবি নিজের হাতে আমার রুটির উপর মাখন লেপিয়া দিত। ভূটান পাহাড়ের একটি কমলা বাগানের মালিকের পক্ষে দেখাশোনার ভার লইয়া সাধন সেন পাহাড়ে আছে। সরস্বতী পূজার কিছুদিন পরে কমলা বাগানে তাহার কাজ শেষ হইবে। তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া জ্যাককে সংগে লইয়া ভূটানের হাটে আসিলাম।

ফরিদপুরের যুগল মাড়োয়ারীর বেশে কাপড় বেচিতে দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। একটি খাবারের দোকানে কয়েকজন ভূটিয়া রুটি মাংস খাইতেছিল। সাধন দোকানে বসিল। অদূরে উঁচু স্থানে কয়েকটা ছাগল চড়িয়া বেড়াইতেছে। উহার সামান্য দূরে একটি বড় পাথরের আড়ালে যুগল চলিয়া গেল। আমার ছাত্র জ্যাক জুয়ার আসরে উবুর

হইয়া পড়িয়াছে। আমি যুগলকে অনুসরণ করিলাম। সাধন আমার পিছনে আসিল। আমরা তিনজন দুইটি বড় পাথরের মাঝখানে বসিলাম।

সাধন বলিল, গুরুতর খবর। সন্তোষ দত্ত ধরা পড়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায়?

—দেরাদুনে।

—নিশিদা?

—তার খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

যুগল বলিল, মোহন সিংয়ের হাতে কিছু মাল পাবে। ওগুলো সাধনের নিকট পাঠাবার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।

আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইলাম। সাধন আমাকে বলিল, আশাকরি বুলাকে চিনেছ।

—মোটামুটি।

—বুলার বাড়ীতে কারা যাতায়াত করে?

—এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি।

—লক্ষ্য রাখবে জলপাইগুড়ির আই, বি ইন্সপেক্টর চামুচি বাজারে আসে কি না।

—আচ্ছা।

—ঠিকাদার বুধাজীর ওপর নজর রাখবে। সন্দেহ হয় লোকটা পুলিশের লোক।

—আচ্ছা।

যাক্ যুগল এখনও বাঁচিয়া আছে। বুকের ভিতর হইতে একটি ভারী পাথর নামিয়া গেল। অসাধারণ তাহার বুদ্ধি, আর অসাধারণ তাহার সাহস। বাঙলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে সেতু সে, এক বিরাট প্রতিভার আধার। বহু ভাষা ও বহু ছদ্মবেশের আড়ালে গোটা ভারতবর্ষ ছুটিয়া

বেড়াইতেছে। সে অন্তরস্থার বহন করিতেছে। আমার সাহস বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। আমি সারাক্ষণ ভাবিতাম। আমার অন্যমনস্কতা কাঞ্চীরানীর কাছে ধরা পড়িয়া গেল। বুলাবিবি ও কাঞ্চীরানী সহোদরা হইলেও আমার কেবল মনে হইত তাহারা যেন সমুদ্রের দুই তীরের মানুষ। জ্যাকের প্রতি যে বুলার দৃষ্টি ছিল না তাহা আমি বলি না; যতদূর দেখিয়াছি জ্যাকের যত্ন কাঞ্চীরানী যেরূপ করিত বুলাবিবি ততটা করিত না। জ্যাকের আহার, পোষাক হইতে পড়াশুনা খুঁটিনাটি সমস্তই কাঞ্চীরানীর নজরে থাকিত। শুধুমাত্র দাদার বাড়িতে শ্রীমানের কীর্তি সে জানিত না। আমি আহারে বসিলে দরজার আড়াল হইতে কাঞ্চীরানী মৃদু স্বরে বলিল, আপনার কি শরীর ঠিক নেই মাষ্টারসাব।

—কৈ না, সবিস্ময়ে বলিলাম।

—জ্যাকের পড়া হচ্ছে না।

—এই কথা, এই বলিয়া আমি একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলাম, ছেলে-মানুষ···মাঝে মাঝে এক আধটু বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক।

—আপনি কথা লুকুচ্ছেন। সারাদিন এত কি ভাবেন?

—ভাবনার কি শেষ আছে! বিদেশে এসেছি···।

—বাড়ীর জন্য মন কেমন করে?

—নিশ্চয়ই করে। করবে না? মা আমার পথ চেয়ে বসে আছেন।

—কিন্তু তাঁদের চিঠি ত আসছে না।

—ঠিকানা না দিলে আসবে কি করে।

—এ আপনার ভারী অন্যায়।

—একটা পাকা ঠিকানা না হওয়া পর্যন্ত দেই কি করে?

—তবুও বাড়ীতে কুশল জানাতে হয়।

—হাঁ হয় বৈ কি। মাঝে মাঝে চিঠি লিখছি। একটা পাকা চাকরি হ'লে মা'কে নিয়ে আসবো।

—আর ভাবি?

কাঞ্চীরানীর জিজ্ঞাসায় আমি থ হইয়া গেলাম। ডিসের উপর মাথা নোয়াইয়া মাংসের টুকরা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ

পরে টের পাইলাম কাঠের পাটাতনের উপর লঘু পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

আমি মিথ্যা আবর্তে ডুবিয়া রহিয়াছি। প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে এবং প্রতি কথায় কথায় আমার অসত্য পরিচয়। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল আমার মিথ্যা পরিচয় শেষ পর্যন্ত এই রমণীর নিকট টিকাইয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বুলাবিবি বিলাসিনী। সব সময় সে নিজেকে পোষাক ও প্রসাধনে সাজাইয়া ফিটফাট রাখে। কাঞ্চীরানীর তেমন পোষাক নাই, বিলাস বলিয়াও কিছু নাই। সাধারণ দুইটি শাড়ি সে পরিত উহার বেশী তৃতীয়টি দেখি নাই। কাঞ্চীরানী বাস্তবিকই মমতাময়ী। তাহাকে মনে হইত যেন সন্ধ্যাবেলার শান্ত স্থির দীঘি। আর বুলাবিবিকে মনে হইত যেন ভুটান পাহাড়ে যাইবার পথে পাহাড়ী নদী। জলের গভীরতা নাই, আছে শুধু স্রোতের বেগ। পাহাড়ী নদীর জলে পা দেওয়া বিপজ্জনক। আমি পাথরের উপর লাফাইয়া নদী ডিংগাইতাম। ভুটিয়া পাহাড়ীদের দেখিয়াছি তাহারা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করিত না। দুরন্ত স্রোতেও অবলীলাক্রমে নদীর জলে পা দিয়া পার হইত। তাহাদের কাঁধে পিঠে ভারী বোঝা থাকিত। পিচ্ছল পাথরে একবারও পা টলিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পড়ন্ত বেলায় জ্যাককে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। চামুচি বাজারের পথে যাই নাই। চা-বাগানের ভিতরে গিয়াছিলাম। জ্যাক ভিতরে ভিতরে উসখুস্ করিতেছিল। নীরস চা-বাগানে নির্জন ভ্রমণ তাহার ভাল না লাগিবারই কথা। আমি বলিলাম, জ্যাক তোমার সবচেয়ে প্রিয় কে?

—সে বলিল, টফি।

—না। না। সবচেয়ে কাকে ভাল লাগে?

—কাকে?

—হুঁ। বলো।

—আমার সবচেয়ে ভাল লাগে 'সুইট ড্যাডি'। তুমি জানো স্যার, ড্যাডি কোনদিন আমাকে বকেনি।

—তারপর আর কাকে তোমার ভাল লাগে?

—আর কাউকে না।

—তোমার মাকে?

—মাম্মি কি আবার ড্যাডির মত আদর করতে পারে না কি। ড্যাডি আমাকে কত জিনিস দিয়েছে। মাম্মি কিচ্ছু দেয় না।

—কি জিনিস তুমি চাও?

—মাই গড্! একটা বন্দুক।

—বন্দুক পেলে তুমি খুব খুশী হবে?

মাথা নাড়িয়া সোল্লাসে জ্যাক বলিল, খুব খুশী হ'ব। তুমি দেবে?

—দেব।

—কবে দিবে?

—তুমি যেদিন তোমার ড্যাডির কাছে নিজের হাতে সুন্দর করে চিঠি লিখবে, সেদিন দেব।

আমার কথার পর জ্যাক কোন শব্দ করিল না। আমার পাশে নীরবে হাঁটিতে লাগিল। চামুচি চা বাগানের বাগানবাবু মিঃ জাফর খাঁনের সংগে বাজারে দত্তবাবুর দোকানে আমার পরিচয় হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি বাগানের কাজ রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। চা-বাগানের মানুষ স্বজাতি হউক না হউক সামান্য পরিচিত ব্যক্তিকে কাছে পাইলে সহজে ছাড়িতে চাহে না। তাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে আমরা বাগানের বাবুদের কোয়ার্টারের নিকট আসিয়া গেলাম। জাফর খাঁন ছাড়িলেন না তাহার বাসায় লইয়া আসিলেন। তাহার বাসার বাহিরের ঘরে কয়েকজন বোধকরি বাগানের বাবু হইবেন গল্প-গুজব করিতেছিলেন। পাশের একটি চা-বাগানে যাহাকে পি, সি, সরকার ম্যাজিক দেখাইতে আসিতেছেন, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। জাফর খাঁনের সহিত আমি ও জ্যাক ঘরে প্রবেশ করিলাম। মজলিসের আবহাওয়া ঘুরিয়া গেল। গল্প বন্ধ হইল। আমি নূতন মানুষ, কিন্তু জ্যাককে সকলেই চিনেন জানেন। জ্যাকের প্রতি প্রত্যেকের বক্র দৃষ্টি আমার অগোচর রহিল না। তিনি বোধকরি পরিমলবাবু হইবেন জরুরী কাজের দোহাই দিয়া উঠিয়া গেলেন। আমাদের আসন গ্রহণ করিবার পূর্বেই ঘর ফাঁকা হইয়া গেল। জাফর খাঁন অবিবাহিত যুবক এবং সরল প্রকৃতির মানুষ। তিনি অপ্রস্তুত হইলেন। জ্যাক ছেলেমানুষ অত বুঝিল না। সে ঘরের বাহিরে খেলিতে গেল।

গৃহস্বামী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, দাদা ব্যাপারটা বুঝেছেন নিশ্চয়ই।

আমি মাথা নাড়িলাম।

তিনি বলিলেন, ছেলেটাকে সংগে করে বাগানে না এলে ভাল করতেন।

আমি বলিলাম, বেড়াতে বের হয়েছিলাম। এখানে আসার ইচ্ছা ছিল না। আচ্ছা মিঃ খাঁন, আপনি বলুন ত ছেলেটার অপরাধ কোথায়?

—এখানেই যত গোল দাদা! দেখলেন ত এঁরা কেমন সতীপনা দেখালেন।

টি গার্ডেনের বাবুদের জীবনে এটা নতুন কথা নয়। সাহেব ব্যাটার

আকেল ছিল না। সব প্রকাশ্যে..... হ্যাঁ বুক ফুলিয়ে করেছে।

জাফর খাঁন সরল মানুষ। সে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ক্রোধের ঝোঁকে চা-বাগানের বাবু মহলের গোপন জীবনের আভাস দিল, কিছুটা আন্দাজ করিতে পারিলাম। বুলাবিবির বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করায় আমি যে বাবু মহলের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছি তাহা পূর্বে টের পাইয়াছি তবুও এতখানি অবজ্ঞা প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। আমার কাছে ইহা শাপে বর হইয়াছে। ডলিকে মনে পড়িল। একদিন সে যে অতি বিশ্রী অতিশয় কুৎসিত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারি নাই।

জাফর খাঁনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিলাম। বাগানের গেটে পৌঁছিয়া দেখিলাম ধান চাউলের বস্তা বোঝাই কয়েকখানা লরী দাঁড়াইয়া আছে। গেটম্যান ঘরে ছিল না। দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। গেটম্যানের বাচ্চা মেয়েটি চাবি আনিয়া গেটের তালা খুলিয়া দিল। লরীগুলি চা-বাগানের ভিতরে চলিল। কয়েকদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছি চা-বাগানে ধান ও চাউল প্রচুর আসিতেছে। হুকুম সিংয়ের লরীগুলি এই কাজে খাটিতেছে। ধুবরী জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে লম্বা লম্বা ট্রিপ দিতেছে। জানিনা ইহার মধ্যে কোন্ লরীর ড্রাইভার হইয়া পাঞ্জাবের মোহন সিং আসিতেছে। প্রত্যহ হুকুম সিংয়ের গ্যারেজের কাছে কিনারে নানা ছুতা করিয়া ঘুরিতেছি। মোহন সিংয়ের সংকেত মেলেনা। হাটের ভিতর মাড়োয়ারীদের বাসার কাছে আসিতে দেখিলাম একখানা জীপগাড়ী তীব্র বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। মিলিটারী গাড়ী। আমার বুকের ভিতর একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল যেন জীপখানা বুলাবিবির বাসা হইতে বাহির হইল। জ্যাক চিৎকার করিয়া উঠিল, লুক্...লুক্।

জ্যাক ঠিকই ধরিয়াছে গাড়ীর ভিতর তাহার গর্ভধারিণী বসিয়া ছিল। অবশ্য ইহা নূতন নহে। প্রত্যহ বৈকালে বুলাবিবি ক্লাবে যাইত এবং

বেশ রাত করিয়া বাসায় ফিরিত। চা-বাগানের লরী অথবা মোটর গাড়ীতে সে যাতায়াত করিত। জ্যাকের উৎসাহের প্রধান কারণ মিলিটারী জীপ গাড়ী। বাসায় আসিলাম। বাঁফৈ লণ্ঠন আনিয়া দিল। তাহাকে প্রসন্ন দেখিলাম না। আমি ভিতরে ভিতরে আশংকা করিতে লাগিলাম।

গভীর রাত।

ধপ্‌·· ধপ্‌ শব্দে আমার ঘুম ভাঙিল এবং হল্লা কানে আসিল। তন্দ্রার ঘোরে মনে হইল বন্য হস্তী ঘরের পাটাতনের নীচে শালের খুঁটি শুঁড়ে জড়াইয়া টানিতেছে। গোটা বাড়ী কাঁপিতেছে। মনে হইল যেন বুলাবিবি ও কাঞ্চীরানী ভয়ে চিৎকার করিতেছে। ঘটনার গুরুত্বে আকস্মিকতায় আমারও যেন হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। পরমুহূর্তে বুঝিলাম আমারই আশ্রয়দাত্রী গৃহকর্ত্রী স্বয়ং বুলাবিবিই মত্ত হস্তিনীর ন্যায় হল্লা করিতেছে। তাহারই দাপা-দাপিতে কাঠের পাটাতন কাঁপিতেছে। "তেরী কলিজা খাউঙ্গী"—একটা বিকট হুংকারে আমি কম্বল ফেলিয়া বসিলাম। লণ্ঠনের কল ঘুরাইয়া আলো বাড়াইয়া দিলাম। বুলাবিবির ঘরে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে বোধকরি যীশুর অথবা মেরীর বাঁধানো ছবির কাঁচ ভাঙিয়া পড়িল। কাঞ্চীরানীর চাপা আর্তনাদ কানে আসিল। কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলাম বুলাবিবি প্রকৃতস্থা নহে। মদ্য পান করিয়াছে। আমার শয্যার শেষে বুলার ঘরের দরজা। নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিলাম না। বন্ধ দরজা ঠেলিয়া খুলিলাম।

দেওয়াল ল্যাম্পের ঈষৎ আলোতে যে দৃশ্য দেখিলাম আমার দুই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, বুলা এক হাতে কাঞ্চীরানীর চুল টানিয়া ধরিয়াছে এবং অপর হাত বাড়াইয়া কি যেন ধরিতে চাহিতেছে। কাঞ্চীরানী প্রাণপণে বুলাকে বাধা দিতেছে যাহাতে খাটের উপর নিক্ষিপ্ত ভোজালি তুলিতে না পারে। আমি তৎক্ষণাৎ

ছুটিয়া গিয়া ভোজালিখানা তুলিয়া পিছনের খোলা দরজার ভিতর অন্ধকারে ছুঁড়িয়া দিলাম। বুলাবিবি চিৎকার করিতে লাগিল, "নিকালো···বদমাস্ নিকালো"।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কে আমার আশ্রয়দাত্রী গৃহকর্ত্রীর আদেশ পালন করিবে। তাহারা নারী, কিন্তু সেই বীভৎস দৃশ্যের সম্মুখে আমার বিচার বিবেচনার জ্ঞান ছিল না। দুই হাতে বুলার হাত টানিয়া ধরিয়া কাঞ্চীরানীকে ডাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। বুলার হাতের উত্তম-মধ্যম আমার পিঠে মাথায় পড়িতে লাগিল। আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বুলার হাত হইতে মুক্ত হইয়া কাঞ্চীরানী আমার ঘরে ছুটিয়া গেল। বুলাবিবি আমাকে ছাড়িয়া সহোদরার পশ্চাৎধাবন করিল।

আমি যে ঘরে থাকিতাম উহার সংলগ্ন ছোট্ট বারান্দার সহিত কাঠের সিঁড়ি ব্যতীত পিছনে আর একটি সিঁড়ি ছিল। বুলাবিবি ও কাঞ্চীরানী সদরে আসিত না, ভিতরের সিঁড়ি ব্যবহার করিত। কাঞ্চীরানী প্রাণভয়ে আমার ঘর ছাড়িয়া বারান্দার অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। বুলা তাহাকে ধরিতে পারিল না। টলিতে টলিতে দরজার পাল্লা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার মাতৃ-ভাষায় যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ হইতেছে এই যে "দুশ্চরিত্রা বজ্জাতি যা তুই বাঘের পেটে যা"। তাহার গর্জন মাত্র মুহূর্তের জন্য থামিল। আমার সম্মুখে টলিতে টলিতে আসিয়া জড়িত কণ্ঠে তাহার মাতৃভাষায় যাহা বলিল তাহারও মর্মার্থ হইতেছে এই যে "এই উল্লুকের বাচ্চা খবর্দার দরজা খুল্‌বি না"। পিঠের বেদনা যাহা হউক সহ্য হইতেছিল কিন্তু আধা হিন্দি আধা বাংলার এই কুৎসিত ভাষায় আমার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে একে নারী উপরন্তু মাতাল, আমার বজ্রমুষ্টি হাতেই রহিল—বুলাবিবির প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়িতেই থামিয়া গেলাম। সমস্ত বিস্মৃত হইলাম। বিলাতি মদের গন্ধে ঘর ভরিয়া ছিল। বুলাবিবির মুখের সাদা ফেনায় বুকের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। চুলগুলি খুলিয়া চতুর্দিকে এলাইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু দুইটি যেন খুলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বহু

কষ্টে আমি শুধু নিজেকে সম্বরণ করিলাম না, গৃহকর্ত্রীকে বারংবার দরজা খুলিবনা বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার ঘৃণিত জিহ্বা শান্ত করাইলাম। অপর ঘরে জ্যাক নিশ্চয়ই ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়াছিল। বাঁফে রাত্রে বাসায় থাকে না। বুলাবিবি অনর্গল হিন্দি বাংলায় প্রলাপ করিতে থাকে। আমি উহার কিছুই বুঝিতে পারি না।

শুধুমাত্র একবার বলিলাম, জ্যাক টের পেলে কি ভাববে বলুন ত ?

মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যের পরিবর্তন হইল। মাতাল সংযত হইল এবং সে বলিল, হুঁসিয়ার। জ্যাককে ডাকবেনা।

আমি বলিলাম, না ডাকছিনা। চুপ করুন। জ্যাকের ঘুম ভেঙে যাবে।

—মাষ্টার, আমাকে একটু ধর ভাই। আমি বিছানায় শোবো।

আমি বুলাবিবির বাহু ধরিলাম। সে আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া অগ্রসর হইল। তাহার ঘরে আনিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলাম। লেপ টানিয়া ঢাকিয়া দিলাম। পিছনের খোলা দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরের বাহিরে ভীষণ ঠাণ্ডায় কাঞ্চীরানী প্রায় খালি গায়ে রহিয়াছে। এই ভীষণ শীতে সে খতম হউক আর না হউক এতক্ষণে বাঘ-ভাল্লুকের নিরাপদ আস্তানায় না পৌঁছিয়া থাকিলে আশ্চর্য হইব। বুলাবিবি ঘুমাইয়াছে। একটুও শব্দ না করিয়া বন্ধ দরজা খুলিলাম। অন্ধকারে মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে ডাকিলাম,

—কাঞ্চীরানি।

সাড়া পাইলাম না।

আবার ডাকিলাম।

তবুও সাড়া মিলল না।

সম্মুখে ভুটান পাহাড় মেঘের কোলে ঘুমাইয়া আছে। পাহাড় জানিল না উহার বুকে কোন জংগলে কাঞ্চীরানী কোন বাঘ না ভাল্লুকের বাসায় ঘর করিতে গিয়াছে। সাহসে ভর করিলাম।

লণ্ঠন তুলিয়া হাতে করিয়া বারান্দায় আসিলাম। বারান্দা শূন্য। এই রাত্রে, এই অন্ধকারে কাহাকেই বা ডাকিব। মাড়োয়ারীবাবুদের বাসা বেশ খানিকটা দূরে। রিজার্ভ ফোর্সের ব্যারাক হইতে ডে-লাইটের একটুকু চিহ্ন কোনমতে কুয়াশা ভেদ করিয়া আসিতেছে। সিঁড়ির কাছে আসিয়া দেখিলাম কাঞ্চীরানী সিঁড়ির ফাঁকের ভিতর হইতে একটু একটু করিয়া মাথা ও শরীর টানিয়া তুলিতেছে। যাক্ সে বুদ্ধি করিয়া কাঠের সিঁড়ির ফাঁক দিয়া নীচে নামিয়াছিল বলিয়া রক্ষা—বাঘ-ভাল্লুক ধরিতে পারে নাই। ঘরের মত হস্তিনী আসিলেও তাহাকে খুঁজিয়া পাইত না। আমার পিছন পিছন পা টিপিয়া সে ঘরে আসিল এবং অতি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ছোট্ট এক ফালি ঘর। চৌকি পাতিবার জায়গা নাই। দিনে আমার শয্যা অর্থাৎ তোশক কম্বল গুটাইয়া ঘরের এক কোণে চাদরে ঢাকিয়া রাখিতাম। তোশক পাতিলে ঘরে দাঁড়াইবার মত জায়গা থাকে না। উভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কাঞ্চীরানী খুব চাপা স্বরে বলিল, বসুন।

আমি বলিলাম, আপনি বসুন।

কাঞ্চীরানী তোশকের উপর বসিল এবং কাঠের দেওয়ালে হেলান দিল। কাঞ্চীরানীর ঘরে যাইবার একটি দরজা ছিল। ইহা ভিতর হইতে বন্ধ। জ্যাক ঘরে আছে। আমি বলিলাম, জ্যাক বোধকরি জেগে আছে।

সে বলিল, উপায় নেই। বইনি দরজায় তালা বন্ধ করে রেখেছে।

এইরূপ অবস্থার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বাঙালী, সে পাহাড়ী; তথাপি এক ঘরে অন্ধকারে থাকিবার সংকোচ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। সে চুপি চুপি কহিল, মাষ্টারসাব বসুন।

—বেশ আছি।

—সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকবেন?

—কিন্তু···।

—কিন্তু আবার কি! বসুন বলছি।

চাপা কণ্ঠের ধমকে বসিলাম।

কাঞ্চীরানী কহিল, মনে করুন দু'জনে ট্রেনে চলেছি। তাহার কথায় বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম পরিবেশকে সহজ করিবার এত সুন্দর যুক্তি এই পাহাড়ী যুবতী কোথায় পাইল। তবুও বলিলাম, এটা ত আর সত্যি সত্যি ট্রেন নয়।

আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া সে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলিল, মনে করতে ক্ষতি কি। ট্রেনে এক বার্থে স্ত্রী-পুরুষ রাত কাটায় কি করে? তাহার কথার দৃঢ়তায় ও সরলতায় আমি আরো বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইলাম। তাহার প্রতি আমার অবহেলা ছিল, অবজ্ঞাও করিয়াছি—কিন্তু এতখানি প্রত্যাশা কখনও করি নাই। সে শীতে কাঁপিতেছিল। কম্বল তুলিয়া তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, নিন্।

—আপনি কী গায়ে দেবেন?

—আমার দরকার হবে না।

—পাহাড়ী হাওয়া আপনার সহ্য হবেনা।

—আলবৎ হবে।

—আঃ তর্ক করবেন না।

—আর যে কম্বল নেই।

—উঁহুঁ।

না, কাঞ্চীরানীর উপস্থিত বুদ্ধি আছে। আমি তোশক ছাড়িয়া দাঁড়াইতেই সে তোশকের অর্ধেক গুটাইয়া শরীর ঢাকিল। আমি কম্বলের ভিতর ঢুকিলাম, শুধু মুখখানা বাহিরে রহিল।

—তারপর কাঞ্চীরানী! ব্যাপারটা কী হ'ল?

—বইনির ঐ ত দোষ। যেদিন বেশী মদ খায়, নেশার ঘোরে মনে করে আমি ওর সাহেবকে কেড়ে নিচ্ছি।

—য়্যা! তাইবলে খুন করতে চায়!

—ও মাতাল। খুনও করতে পারে। তবে কি জানো সকালে উঠে ওর

কিছু মনে থাকবে না। আজ বড্ড বেশী মদ গিলেছে। অন্যদিন অজ্ঞান গেলে। তাতে সাহেবের কথা মনে পড়েনা।

আমি প্রথম অবস্থার সংকোচ কাটাইয়া উঠিয়াছি। কাঞ্চীরানী নিজ গুণে সর্বদাই সহজ ছিল এবং কখন যে আমরা পরস্পর 'তুমি' হইয়া গিয়াছি তাহা জানিতে পারি নাই। কাঞ্চীরানী আমাকে বলিয়াছিল, 'তুমি ভদ্রলোক। তোমার মন পবিত্র। মনের ওপরেই দেহের সম্পর্ক'। তাহার এই উক্তি আমাকে শক্তি দিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিলাম কাঞ্চীরানীর নির্ভরতা কতখানি।

আমি বলিলাম, কাল সকালে মুখ দেখাবে কি করে?

—কেন?

—বাঃ বেশ ত! বুঝলেনা!

—বুঝেছি। ওটা কিছু নয় মাষ্টারসাব। পুরুষের ঘরে রাত কাটবে এটা আমাদের জীবনে এমন কি কথা।

—সত্যি, কাটিয়েছ না কি!

—তুমি এলে সেদিন। জানবে কি করে।

—তাইত।

—মাষ্টারসাব! তুমি আমাদের জানোনা। তাইত এমন ভাবছ।

—সত্যি জানি না।

—বাজারের লোক কিছু বলেনি?

—মুখে কিছুই বলেনি।

—মুখে কেউ কোনদিন বলেনা, ব্যবহারে বুঝিয়ে দেয়। তুমি এখনও টের পাওনি আমরা সকলের ঘৃণিতা।

—হয়ত কিছুটা পেয়েছি।

—জানতে পাওনি আমরা শুধু পুরুষদের মদের গ্লাসের সাথী।

—ছিঃ কাঞ্চীরানী! ছিঃ!!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে আর কথা বলিতে পারিল না। বুঝিলাম গভীর বেদনায় তার লাঘবের চেষ্টা করিতেছে। অনেকক্ষণ পর আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি মদ খাও?

সে বলিল, না।

—কোনদিন খাওনি ?

—না।

—তবে যে ওকথা বললে ?

—আজ থাক মাষ্টারসাব, অন্য একদিন বলবো। আমার একটা কথা আছে।

—বেশ। বলো।

—তুমি যেন দিনের বেলায় কখনো আমার সংগে কথা বোলো না।

—মনে থাকবে।

—রাগ করলে মাষ্টারসাব ?

—না

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমি ভিতরে ভিতরে পুড়িতেছিলাম। বুলাবিবির বাসার অন্নজল বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। তবুও যেমন ছিলাম ঠিক তেমন রহিলাম। আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই, উপায় নাই এবং জেলখানা ব্যতীত যাইবার জায়গা নাই। একটি গুরুতর দায়িত্ব আসিয়াছে। কর্তব্যের আহ্বানে আমি সব সহ্য করিতে পারিলাম।

মোহন সিং আসিয়াছে। সে বেশী মাল আনিতে পারে নাই। কয়েকটি মাত্র রাইফেল কমলা তুলিবার টুকরির মধ্যে গুঁজিয়া পাহাড়ে সাধন সেনের নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম। সামান্য কার্তুজ ও ডিনামাইট সমতলা (কমলা) বাগিচার হাটের চাউল ও আটার ব্যাগের মধ্যে লুকাইয়া পাহাড়ে চালান হইয়া গেল। মোহন সিং শীঘ্রই আবার আসিতেছে। তাহাকে একটি রিভলভারের কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। উহার বিশেষ আবশ্যক। ঠিকাদার মুখার্জীর উপর নজর রাখিতেছি। দরকার হইলে তাহাকে শেষ করিতে হইবে।

মাঝখানে কয়েকটি দিন কাজের চিন্তায় কাটিয়া গেল। গৃহকর্ত্রী বুলাবিবি ও তাহার 'বহিনি' কাশ্মীরানীর সেই রাত্রের কাহিনী ভুলিয়া গেলাম। জ্যাককে পড়াইতেছিলাম। বুলাবিবির ঘরে ডাক পড়িল। গেলাম।

—মাষ্টারসাব। জরুরী চিঠি লিখতে হবে।

—এখন ?

—হ্যাঁ। বাদৈ···বাদৈ।

বাদৈ আসিল না। কাশ্মীরানী চায়ের কাপ হাতে করিয়া ঘরে আসিল। বুলাবিবি বোধকরি অন্যান্য দিন হইতে একটু সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াছে। কাশ্মীরানী তাহার হাতে চায়ের পাত্র তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সে খাটের উপর বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

আমি কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলাম।

বুলাবিবি কহিল, সাহেবের গার্ডেনের বাঙালী ম্যানেজার শালালোক বহুৎ নিমকহারাম।

আমি স্বজাতির নিন্দায় হাঁ করিলাম।

সে হিন্দিতে বলিল, তুই আমার সাহেবের কাছে লিখে কী করবি। লেখ না।

আমি চিঠির প্যাডের মলাটে সোনার পার্কার কলমে নীরবে আঁচর কাটিতে লাগিলাম।

—এই মাষ্টার!

—উঁ।

—তোমরা এমন কেন?

—আমরা! মানে?

—এই তোমরা বাঙালী আদমী এমন হিংসুটে কেন। ঐ 'ম্যানেজার শালালোক' প্রথমে গার্ডেন কোয়র্টর থেকে তাড়ালে। এখন কি না···। এই পর্যন্ত বলিয়া সে সহসা চুপ করিল। তাহার হিন্দি ভাষা এত কর্কস ও কুৎসিত ইহা সকলের পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

সে পুনরায় কহিল, আমার বইনিটা আবার তোমাদের বাঙালীর। আমার বাপ সাহেব, আর ওর বাঙালী। আমি কান পাতিয়াছিলাম। বুলার কথায় চমকিয়া উঠিলাম। একটুর জন্য হাতের কলম নীচে পড়িয়া গেল না। আমি বহু কষ্টে কহিলাম, আমাকে যেতে দিন।

—গোঁসা করছ কেন?

—এসব কথা আমার ভাল লাগেনা।

—তা করবে কেন মাষ্টার। বইনির কথা তোমার শুনতে ভাল লাগবে কেন। সেদিনের রাতটা...।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে একটা কদর্য শিস দিয়া থামিল। আমার মনে হইল যেন কাঠের দেওয়ালে ঝুলানো জ্যাকের হান্টার আমার মুখে পড়িল।

—থাক্ থাক্ খুব লজ্জা পেয়েছ মনে হচ্ছে।

বেশ কৌতুকপূর্ণ সহানুভূতির সহিত সে পুনরায় বলিল।

কাতর স্বরে আমি বলিলাম, এ কথা আর কোনদিন বলবেন না।

—কেন ?

—আমি আপনার ছেলে পড়বার কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

—আরে···রে ছোঃ। তুমি ছাড়লে আমি তোমাকে ছাড়বো ভেবেছ। জানো এই রেঞ্জের সব অফিসার সাহেব আমার হাতে।

—হয়ত হ'বে। আমি আপনার এ সব বিশ্রী নোংরা কথা শুনতে প্রস্তুত নই।

—না, তুমি দেখছি ঝগড়া করতে পার। আর কোন বাঙালী আমার মুখের উপর টু শব্দটি করতে পারেনি। সাহেব গার্ডেনে থাকলে কত বাঙালীবাবু এই বুলার বাসায় রোজ এসেছে।

—কেন ?

—কেন আবার দরবার করতে। গার্ডেনে নকরি কর তারপর বুঝবে দরবার কাকে বলে। আগে আমাকে সন্তুষ্ট করে তারপর ত আমার সাহেব। ঐ যে রূপার প্লেট দেখছ ওটা ঐ 'শালালোক' বাঙালীটা আমাকে কলকাতা থেকে এনে ভেট দিয়েছিল। 'ড্যাম' বজ্জাতটা আমার পিছনে লেগেছে। নাও লিখতে থাক।

বুলাবিবির উষ্মা জল হইয়া গেল। সে চিঠির বয়ান বলিতে লাগিল। আমার হাত একটুও কাঁপিলনা, একবারও থামিলনা, বুলার 'ভেরি সুইট হার্ট' মিঃ বলডুইনের নিকট তাহার একনিষ্ঠ নিবিড় প্রেম সোনার পার্কার পেনে নিবেদন করিয়া লিখিলাম। বাস্তবিকই বুলা খুব সাবধানী। সে যে পাকা খেলোয়াড় উহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। প্রতিটি কথার ভাঁজে ভাঁজে সে শুধু তাহার 'ভেরি সুইট হার্টের' অনুপস্থিতির বেদনা প্রকাশ করিলনা, সে যে কিরূপ অসুবিধার ভিতর দিয়া চলিতেছে তাহাও প্রকাশ করিল।

—মাষ্টার !

—উ।

—চা খাবে ?

—হ'লে হয়।

—হ'লে হয় মানে? তুমি যা চাইবে তা-ই দেব। শুধু তোমাদের বাঙালীদের একটা মাত্র জিনিস দিতে পারব না। বুঝেছ কী?

বুলার কথার ধরনে আমি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলাম। সে ফিক্ করিয়া হাসিল।

হাসি থামাইয়া সে বাবৈকে ডাকিল।

বাবৈ আসিল।

বুলা হুকুম করিল, চিয়া লাও।

যেমন হুকুম, তেমন কাজ। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাবৈ চা আনিল। বুলাবিবি দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, অনেকখানি লিখেছ দেখছি। দেখি, দেখি।

আমি বলিলাম, এখানেই শেষ করব কি?

—না, না, না। রোমেো আরও আছে।

—বলুন।

—এবার···হ্যাঁ জ্যাকের লেখাপড়ার কথা কিছু লেখ।

—বলুন কি লিখব।

—এটা তুমি নিজে গুছিয়ে লিখবে মাষ্টার। লিখবে জ্যাকের খরচের জন্য আরো টাকা চাই।

—আরো চাই?

—অবাক করলে মাষ্টার। টাকা চাই এই কথাটি দুনিয়ায় কে না বলছে। তুমি আমার সাহেবকে দেখনি কি চমৎকার মানুষ।

গভীর আবেগের সহিত শেষের কথাগুলি বলিয়া বুলাবিবি হাতের অর্ধেক পোড়া সিগারেট ছ্যাসট্রেতে না গুঁজিয়া জানালার দুই শিকের ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল।

—মাষ্টারসাব!

—কে? কাঞ্চীরানী···এসো।

জ্যাক নীচে খেলিতেছে। আমি বারান্দায় কাঠের রেলিংয়ের উপর উবুর

হইয়া ধূসর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিলাম। সারাদিনের মেঘলা ফিকে আলো প্রাক সন্ধ্যায় কমিতেছে।

—কি ভাবছ ?

কাঞ্চীরানী কখন যে আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টের পাই নাই। তাহার প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলাম।

সে পুনরায় কহিল, আমি জানি তুমি কি ভাবছ।

—কি ভাবছি বলতে পার ?

—পারি।

—বেশ বলো।

—ভাবছ বুলার কথা।

—ঠিক ধরেছ।

—অথচ তারপরও তুমি এ বাসায় রয়েছ।

—না থেকে উপায় কি বলো। আর কোথায়ও যে আমার যাবার জায়গা নেই।

একটা অতিবড় সত্য কথা পরিষ্কার বলিলাম।

কাঞ্চীরানী বলিল, আছে।

—কোথায় ?

—ঐ পাহাড়ে।

এই বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া পাহাড় দেখাইল। সে আরও বড় সত্য কথা বলিল।

আমি বলিলাম, ওখানে কেন ?

—বেশ ত তুমি। কেন ? জপ-তপ করবে।

এই বলিয়া কাঞ্চীরানী হাসিল। আমি হাসিলাম। সে কহিল, আচ্ছা মাষ্টারসাব! তুমি ঘর ছেড়েছ কেন ?

— কতবার বলব, চাকরির জন্য।

—মিছে কথা।

—মোটেও মিথ্যা নয়।

—যদি চাকরির জন্য ঘর ছাড়বে ত এখানে পড়ে আছ কেন ?

—কাজ পাচ্ছিনা বলে।

—কাজের অভাব কোথায়।

—তাই না-কি। বেশত একটা কাজ জুটিয়ে দাও।

—তোমার এই বয়স, এমন স্বাস্থ্য, যুদ্ধে গেলেই হয়।

—ও-রে বাবাঃ যুদ্ধে নয়।

—মরতে ভয় পাও মাষ্টারসাব ?

—না পাইনে। বর্বর বন্য জীবনকে ভয় পাই। ঘৃণা করি। তুমি জানোনা কাঞ্চীরানী মিলিটারি জীবন কি জঘন্য।

—জঘন্য !

—হ্যাঁ জঘন্যই। রূপহীন, স্নেহমমতাহীন নিষ্ঠুর জীবন।

—আমারও কিন্তু অনেকবার তা-ই মনে হয়েছে। আমি দার্জিলিং থেকে পালিয়ে এসেছি।

—পালিয়ে এসেছ ! কেন ?

—সাহেবদের খপ্পরে আমি যেতে চাইনি।

এই বলিয়া কাঞ্চীরানী অনেকক্ষণ নীরব থাকিল। আমি তাহাকে বিরক্ত করিলাম না। সে পুনরায় কহিল, বুলাকে মদে ধরেছে। আজ রাতে সাবধানে থেক।

—আজ আবারও গেল।

—ওটা বিশ্রী নেশা। যাকে একবার পায় সে ডোবে।

—তুমি কি করবে ?

—চলে যাব।

—কোথায় ? হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় অহেতুক প্রশ্ন করিলাম। রাত্রে সে কি করিবে···আমার এই প্রশ্ন ধরিতে পারিল না, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিল। সে বলিল, তোমার সংগে নিয়ে যাবে মাষ্টারসাব ? আমি তোমাদের বাড়ী থাকব ?

—আমাদের বাড়ী ?

—হুঁ।

—তাইত কাঞ্চীরানী···বড় ভাবনায় ফেল্‌লে।

—কেন মাষ্টারসাব !

—আমরা সমাজে বাস করি। আমাদের অবস্থা তেমন নয়। তোমাকে নিয়ে তুলব কী করে।

আমার কথায় সে যেন ব্যথা পাইল।

সে বলিল, তোমাদের সমাজ কী অসহায়কে কখনও আশ্রয় দেয়না মাষ্টারসাব।

—সে কথা নয় কাঞ্চীরানী। আমাদের অভাবের ঘর, দিন চলেনা।

—ও বুঝেছি।

—তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর। ঢাকায় যাবে ?

—ঢাকা ! সে কোথায় ?

—পূব বাঙলায়, পদ্মানদীর ও পাড়ে মস্ত শহর। ওখানে তুমি গেলে তোমাকে একটা ঠিকানা দিতে পারি। মেয়েদের স্কুলে আমার দিদি কাজ করেন। তুমি ওদের স্কুলের বোর্ডিংয়ে একটা কাজ পাবে।

—সত্যি বলছ মাষ্টারসাব।

—হ্যাঁ। সত্যি বলছি।

—বেশ। আমি যাব।

—কিন্তু একটা সর্ত থাকবে।

—সর্ত !

—হ্যাঁ। আমি এ বাসা ছেড়ে চলে গেলে তুমি ঠিকানা নিয়ে সেখানে যাবে।

—এর আগে নয় কেন ?

—তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবনা কাঞ্চীরানী। আমার ভবিষ্যৎ আছে।

—তাতে আমার সম্পর্ক কি।

—একটু আছে।

—ধ্যেৎ, অস্ফুট শব্দ করিয়া সে দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতর অদৃশ্য হইল। আমি হাল্কা হইলাম। সর্বদা সংশয়ের ভিতর থাকি। কথার মাঝে আমার ফেরারী জীবনের গন্ধ বাহির হয় এই আশংকা আমার নিঃশ্বাসে

নিশ্বাসে ফিরিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম কাঞ্চীরানী কেন দার্জিলিং ত্যাগ করিয়া চা-বাগান পরিবেষ্টিত নির্জন প্রান্তরে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। বুলা ও কাঞ্চী উভয়ে সহোদরা হইলেও আমার মনে হয় তাহারা উভয়ে যেন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করিতেছে। বুলা অগভীর, অসংযমী; আর কাঞ্চীরানী গভীর, শান্ত ও স্নিগ্ধ। এই কয়েক দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছি কাঞ্চীরানী বাস্তবিকই পরিচ্ছন্ন। মার্জিত রুচির আড়ালে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। বুলা রুচিহীন, এত কদর্য যে তাহার সংস্রব আমার নিকট বিষের মত মনে হইত।

কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাকের যে কাজ সে উহা করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। কাঞ্চীরানী তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্বে বাইক চলিয়া যায়। বাসায় মাত্র আমরা দুইজন। বৈকালে বুলাবিবি সাজিয়া গুঁজিয়া বাহির হইয়াছে। কখন ফিরিবে কোন ঠিক নাই। আমি শয্যার উপর বসিয়াছিলাম। এক কোণে পিট্ পিট্ করিয়া লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। হঠাৎ টুপ করিয়া শব্দ হইল। পিছনে চাহিয়া দেখিলাম এতক্ষণের বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। ছায়াছবির মত কাঞ্চীরানীর শরীর একটু একটু করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

—তারপর কাঞ্চীরানী ?

—এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলনা, মাষ্টারসাব। এই পর্যন্ত বলিয়া সে চুপ করিল। আবছা অন্ধকারে বুঝিতে পারিলাম তাহার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে।

রাত কত হইয়াছে জানিনা। বুলাবিবি তখন পর্যন্ত বাসায় ফিরে নাই। বুলার ঘরে একটি দেওয়াল ঘড়ি আছে, যত্নের অভাবে বন্ধ হইয়া ছিল। অনেকক্ষণ পূর্বে বাগানের ঘড়িতে রাত বারটা টের পাইয়াছিলাম। কাঞ্চীরানী আমার ঘরে আশ্রয় নিয়াছে। আমার বালিশের উপর মুখ রাখিয়া উবুর হইয়া শুইয়াছিল। কম্বলের নীচে শরীর ঢাকা। আমি তাহার মাথার পাশে কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিয়াছিলাম। বুলাবিবি বাসায় ফিরিলে এবং পিছনের দরজা খুলিয়া তাহাকে বিছানায় না শোয়ানো পর্যন্ত কাঞ্চীরানীকে আমার ঘরে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। কাঞ্চীরানী দরজা খুলিয়া দিলে নির্ঘাত খুনাখুনি হইয়া যাইবে।

আমি ধীর স্বরে বলিলাম, একটা কথা। অবশ্য তুমি যদি কিছু মনে না কর তবে বলি।

—বলো, অম্লান স্বরে সে বলিল।

—সহজ ভাবে নেবে ?

—নেব। বলো।

—তোমাদের জীবনে এ হয়ত খুব বড় কথা নয়। তবুও তুমি তোমার দিদির মত জীবন কাটাতে পারলেনা কেন ?

আমার কথার শেষে সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করিল, অথবা হয়ত বাংলা শব্দ গুছাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাইত আমি মাজিলিং

ছেড়েছি মাষ্টারসাব। তুমি জানোনা মিলিটারি লোকেরা কি ভয়ঙ্কর। ওদের দেখলে আমার ভয় করে।

—কি বললে। ভয় করে?

—হ্যাঁ করে। এমন কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করেছে পথে বের হওয়ার উপায় নেই।

—তোমার কাছে এ কথা শুনে সত্যি অবাক হচ্ছি। তোমাদের প্রশ্রয় না পেলে ওরা এতখানি নির্লজ্জ হতে পারতনা।

কাঞ্চীরানী আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল।

সে বলিল, তুমি আসল কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছ মাষ্টারসাব। বলো শুধু প্রশ্রয় নয় আমাদের আশ্রয়ও। দার্জিলিং এর আগে এত টাকা আর এত খাবার একসাথে চোখে দেখিনি।

—তুমি কি বলতে চাও আর একটু পরিষ্কার করে বলো কাঞ্চী।

—না···না···না। ও টাকা আমি চাইনে···চাইনে; বহু কষ্টে এই পর্যন্ত বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কণ্ঠস্বরে টের পাইলাম। আমি আশ্চর্য হইলাম। এই সেই কাঞ্চীরানী যে কিছুদিন পূর্বে তাহার গোপন জীবনের এক অধ্যায় প্রসূতি সদনে গোপনে রাখিয়া আসিল। বিস্মিত হইলাম, কাঞ্চীরানী তথাপি তাহার পরিচিত মহলের পাহাড়ী সুন্দরীদের মত অর্থ আহার্য কিছুই স্পর্শ করিলনা—দার্জিলিং হইতে পলায়ন করিল। কোথায় মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যদের রেষ্ট হাউস্ দার্জিলিং আর কোথায় জনমানবহীন এই পাহাড়ের পাদদেশ, কাঞ্চীরানীর পিতৃক্ষা বৈরাগ্য আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

—কাঞ্চীরানি, আমি ডাকিলাম।

—উঁ, সে সাড়া দিল।

—তুমি কি কাউকে ভালবেসেছ?

—হুঁ।

—তাকে ছেড়ে এলে কেন?

—কেন? সে আমার মনিব।

—য়্যা তোমার মনিব!

—হ্যাঁ।

আমার মনে হইতে লাগিল যেন ঐ বিশাল পাহাড় ভাংগিয়া আমার এই এক ফালি নামমাত্র শয্যায় গুঁড়া গুঁড়া হইতে লাগিল। আমি বাধা দিলাম না। কাঞ্চীরানী কাঁদিতে লাগিল। তাহার দ্রুত নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে কাঠের পাটাতন দুলিতে লাগিল।

জ্যাক ঘুমে অচেতন। মাঝে মাঝে বাঘের ডাক শোনা যায়, কাঠের বাড়ী থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। আমি নীরবে বসিয়া রহিয়াছি। নিজেকে সংযত করিতে কাঞ্চীরানীর অনেক সময় লাগিল। চা-বাগানের গাড়িতে ঢং ঢং দুইটি শব্দ কানে আসিল এবং মনে হইল যেন আর একটি শব্দও হইল। আমরা জীপ গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতেছি। একটি ভারী ট্রাক গোঁ গোঁ শব্দে চা বাগানে প্রবেশ করিল। মৃদু স্বরে কাঞ্চীরানী বলিল, তোমার কষ্ট হচ্ছে মাষ্টারসাব?

—না।

—কতক্ষণ আর জেগে থাকবে। একটু ঘুমিয়ে নাও।

—থাক্ কাঞ্চীরানী। তুমি বরঞ্চ ঘুমোও।

—আমার ঘুম আসবে না। মনে হচ্ছে বইনি রাতে ফিরবেনা। বেশী মদ গিল্‌লে উঠতে পারেনা।

—বুলাবিবি এত মদ খায় কেন বুঝতেই পারিনা।

—আচ্ছা মাষ্টারসাব! তুমি কখনো মদ খেয়েছ?

—না। আমাদের ওটা খেতে নেই।

—এই ভরসাতে তোমার কাছে রয়েছি। অথচ দার্জিলিংয়ে বাঙালীদের মদ খেতে দেখেছি।

—ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। দু'বেলা আমাদের ভাত জোটেনা মদের পয়সা পাব কোথায়। আচ্ছা কাঞ্চীরানী……আমি হঠাৎ থামিলাম।

—থামলে কেন? সে বলিল।

—সত্যি কথা বলবে।

—বলব।

—আমি পুরুষমানুষ। আমাকে তোমার ভয় করেনা?

—করত। কিন্তু এখন করে না।

—কেন?

—তুমি ওদের মত নও বলে। তোমার বিবেক আছে। তোমার আত্মা পবিত্র।

—এ ভাবে না থাকলে ভাল করতে। তোমার দিদি কিশ্রী মনে করে।

—বইনির স্বভাব এই ধরনের। আমার কথা বইনি তোমাকে বলেনি?

—কী কথা কাঞ্চীরানী!

—আমার আর ওর……।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল না উদ্যত জিহ্বা দাঁতে চাপিয়া ধরিল বুঝিলাম না।

আমি বলিলাম, ও কথা থাক্।

সলজ্জ স্বরে সে কহিল, বইনির চোখের আড়ালে চলে গেলে বেঁচে যাই। আমি ঢাকায় যাব।

—আর ফিরবেনা?

—ফিরেই বা কি হবে! যা হারিয়েছি তা আর কোনদিন ফিরে পাব না।

—পাবে।

—কি বল্লে মাষ্টারসাব?

—বললুম তুমি কিছু হারাওনি কাঞ্চীরানী। তোমার এ ব্যথা ধীরে ধীরে কেটে যাবে।

—ছোঃ ছোঃ। তুমি দেখছি নেহাত ছেলেমানুষ। আমি যদি বুলার মত হতাম তবে ভুলতে পারতাম।

—ও। তাই বুঝি সে এত মদ খায়।

—না। আমার মা ওকে মদ ধরিয়েছে।

—তোমার মা!

—হ্যাঁ।

—তোমার মা এখন কোথায় ?

—মরেছে। অনেকদিন আগে আমি তখন সাত বছরের আমার মা মরে গেল। আমার মাসীর বাড়ী দার্জিলিংয়ে বড় হয়েছি।

—স্কুলে পড়েছ ?

—না।

—তুমি কিন্তু চমৎকার বাংলা বলতে পার।

—তোমাকে সেদিন বলেছি। আমার মাসী ছিল ওখানে এক সাহেবের বাসার আয়া।

—তাঁরা কি বাঙালী ছিলেন ?

—হুঁ। ব্যানার্জী সাহেব।

—এখন তাঁরা কোথায় ?

—বড় সাহেব নেই। ছোট সাহেব বোম্বে থাকেন।

—আর সকলে ?

—সকলে বোম্বে চলে গেছেন।

—তুমি গেলে না কেন ?

—এ প্রশ্ন তুমি কোরোনা মাষ্টারসাব।

—বেশ করবনা। যদি কোনদিন ছোট সাহেব তোমার খোঁজ করেন ?

—কোনদিনই তিনি তা করবেন না।

—কে বল্‌লে করবে না। আলবৎ করবে।

—না। কেউ কোনদিন তা করে না। আমার মা'কে আমার বাবা খোঁজ করেনি।

—জানিনা তোমার মা কেমন ছিলেন। তোমার জীবন দেখছি সম্পূর্ণ আলাদা।

—মাষ্টারসাব! পাহাড়নীর রূপ যৌবন এক কথা—আর তুমি যা বলতে চাইছ তা আলাদা কথা।

—হ্যাঁ তোমাকে আমি আলাদা করে দেখেছি কাঞ্চীরানী।

—কেন ?

—তুমি ত ওদের মত সহজ লভ্য আর লোভী নও।

—কে বললে নই ?

—যদি হ'তে তবে এই বাজারে দার্জিলিং ছেড়ে পালাবে কেন ?

এতক্ষণ পর্যন্ত সে মৃদু স্বরে আমার কথার জবাব দিতেছিল। সে আর জবাব দিলনা, কথাও বলিলনা। বুঝিতে পারিলাম নেহাত ঝোঁকের মাথায় তাহার গোপন জীবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি। কাঞ্চীরানী বয়সে আমার সামান্য ছোট। তাহার হিসাবে উনিশ। স্বাস্থ্য একহারা একটু লম্বা ধরনের। নাকটা বুলার তুলনায় একটু উঁচু। মুখের ছাদ পাহাড়ী, শাড়ী পরিলে বাঙালী বলিয়া মনে হয়। আমার খেয়াল ছিলনা সে ভিন্ জাতি এবং তাহার ব্যক্তিগত জীবনে আমি অহেতুক কৌতূহলী হইয়াছি।

ব্যথিত স্বরে বলিলাম, তুমি আমার কথায় দুঃখ পেয়েছ কাঞ্চীরানী। এসব কথা আমার বলা ঠিক হয়নি।

—মাষ্টারসাব !

—বলো।

—তুমি কথা বলেছ বলে আমি কথা বলছি। আমার কত কথা বুকে চাপা পড়ে আছে। শুনবে তুমি ?

—না।

—বেশ। বলবনা। কোনদিন যদি মনে পড়ে এই পাহাড় মুলুকে কাঞ্চী বলে একটি মেয়ে ছিল, সেদিন কিন্তু হেসোনা।

—ছিঃ। হাসব কেন।

—তুমি আমাকে ঘেন্না কর না মাষ্টারসাব ?

—না।

—আমার পাপের কথা জেনেও বল্‌ছ 'না'।

—তুমি ভালবেসেছ কাঞ্চীরানী, পাপ করনি।

—মাষ্টারসাব ! তুমি বাঙালী। তুমি হিন্দু। তুমি বল্‌ছ আমি পাপ করিনি।

—হ্যাঁ বলছি। শুধু বলছি নয় জগতের সামনে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি ভালবাসা পাপ নয়।

আমার কথা শেষ না হইতেই কাঞ্চীরানী হাসিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, তুমি হাস্‌ছ কাঞ্চী!

—বাঃ হাসির কথা বললে হাস্‌বনা।

—এটা কি হাসির কথা হোল।

—তুমি ঘর বাঁধনি সংসার করনি মাষ্টারসাব, তাই জানোনা ভালবাসার পথ খোলা নয়।

—আমি তর্ক করবনা কাঞ্চীরানী। মানুষের জীবনের নীচে আর একটা জীবন আছে। পাঞ্জাবীর নীচে গেঞ্জির মতই সে জীবন। ওটা প্রকাশ পায়না বলে পাপ কথাটা ব্যবহার করে। নইলে দেখতে পাপ কথাটা একেবারে অসত্য ধাপ্পা মাত্র।

আমি আবেগের সহিত বলিতেছিলাম। আমার কথা শেষ হইবার পূর্বে জীপের শব্দ বাসার কাছে আসিয়া গেল। কাঞ্চীরানী নিমেষের মধ্যে কম্বলের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইল। আমি লণ্ঠনের আলো বাড়াইয়া দরজা খুলিয়া বুলার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

এ কী ভয়ংকর দৃশ্য দেখিতেছি। বুলাবিবির পোষাক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। তাহার চক্ষু মেলিবার শক্তি নাই। জীপের নেপালী ড্রাইভার বুলার অচেতন দেহ কাঁধে তুলিয়া নীচ হইতে উপরে আনিয়া শয্যায় নামাইয়া দিয়াছে। আমি এক লাফে দরজা ডিংগাইয়া কাঞ্চীকে ঠেলিয়া তুলিলাম। বুলার গলা ও বুক নোংরা বমিতে ভরিয়া আছে। মদের দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া আছে। উনুনে সর্বদা গরম জল থাকিত। কাঞ্চীরানী একটা এনামেলের গামলা ভরিয়া গরম জল আনিল এবং তোয়ালে ভিজাইয়া বুলার মুখ ও বুকের বমির আঠা তুলিতে লাগিল।

কাঞ্চীরানী বলিল, মাষ্টারসাব ওকে ধরে উঁচু কর। গায়ের কাপড় পালটে দেই।

—তুমি একা পারবেনা ? আমি ও ঘরে যাই।

—দাঁড়াও। রোগীকে লজ্জা করছ কেন। আমি একা পারবনা।

আমি বিস্মিত হইলাম। কাঞ্চীরানীর কথায় আমার সংকোচ কাটিয়া গেল। বহু কষ্টে বুলার গায়ের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পোষাক খুলিয়া কাঞ্চীরানী একটি বিছানার চাদরে বুলার সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দিল। আমি গরম জলে তোয়ালে ভিজাইয়া বুলার কপালের ক্ষত পরিষ্কার করিয়া দিলাম। কপাল কাটিয়া রক্ত চাপ ধরিয়া ছিল। কাঞ্চীরানী আইওডিনের শিশি খুলিয়া তুলায় অষুধ ঢালিয়া আমার হাতে দিল। আমি ক্ষত স্থানে সযত্নে মাখাইয়া দিলাম। কাঞ্চীরানী ফিস্ ফিস্ স্বরে বলিল, একটুর জন্য জানোয়ারগুলোর হাত থেকে বেঁচে এসেছে।

আমি বলিলাম, ওর জ্ঞান ফিরছেনা। এত রাতে ডাক্তারই বা পাই কোথায়।

—চুপ্ চুপ্। ডাক্তার কেন ?

—তুমি একা সামলাতে পারবে কাঞ্চীরানী।

—পারব। উনুনের কেৎলীতে গরম জল আছে। তুমি ওটা দিয়ে শুয়ে পড়। এ ঘরে আর আসবে না।

—তুমি ঘুমুবেনা কাঞ্চীরানী ?

—আঃ মাষ্টারসাব। যাও···।

চামুচি বাজারে বুলাবিবির বাসায় উঠিয়া আমার গানের সমাদর শেষ পর্যন্ত যেটুকু চা-বাগানের বাবুমহলে হইয়াছিল তাহা গিয়াছে। বাজারে একমাত্র দত্তবাবুদের দক্ষিয়রে যাতায়াত করিতাম। এই দোকানে বসিয়া ঠিকাদার মুখার্জীর উপর নজর রাখিতাম। বছর পঁয়তাল্লিশের খর্বাকৃতি, মাঝারি মোটা, মাথাভর্তি টাক এই মানুষটির মুখের কথা অতিশয় মিষ্টি। কেবল তাহার চক্ষু দুইটিতে আমার সন্দেহ হইত। দত্তবাবুর দর্জি দোকানের সম্মুখে মিঠাইয়ের দোকানের পিছনে মুখার্জীর বাসা। দত্তবাবু অবিবাহিত। নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়ায় তাহার বাড়ী। অত্যন্ত মিশুকে মানুষ। তাহাকে দেখিলে মনে হয়না যে তাহার বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। সেদিন দোকানে আসিতে না আসিতে তিনি মেশিনের কাজ বন্ধ করিয়া কহিলেন, ওহে গুণধর! তোমার নেমতন্ন আছে।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, কোথায় ?

—চলো দেখবে।

এই বলিয়া দত্তবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঠিকাদার মুখার্জীর বাড়ীর ভিতর আনিলেন। ঘরের বাহিরে উঠানে একটি হরিণ শাবক লইয়া বছর ছয়েকের বালিকা খেলিতেছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া দত্তবাবুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আমি তাহাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি খুকু ?

খুকু লজ্জায় দত্তবাবুর কোলে মুখ গুঁজিল।

দত্ত বলিলেন, কাকুকে তোমার নাম বলো।

আধা স্বরে খুকু বলিল, মামণি।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর হইতে মুখার্জী গিন্নী বারান্দায় বাহির হইয়া

আসিলেন। প্রায় পঁচিশের কাছে অনিন্দ্য সুন্দর তনুশ্রী। তিনি একটু হাসিলেন, আমি দেখিলাম তাহার গালে সুন্দর টোল ফুটিয়া উঠিল। আমার মনে সন্দেহের আনাগোনার বিরাম ছিলনা। আমি যতদূর পারি সতর্ক হইলাম। অতিশয় বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম মুখার্জী গিন্নী প্রথম পরিচয়ে আমাকে অত্যন্ত আপন করিয়া নিলেন। বয়সে আমি তাহার ছোট বলিয়া প্রথম আলাপে 'তুমি' বলিলেন।

দত্তবাবু বহু সময় পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন। চা ও জলখাবার শেষ করিয়া গল্প করিতেছিলাম। মুখার্জী গিন্নী বলিলেন, একটি অনুরোধ রাখবে ভাই!

আমি চমকিয়া উঠিলাম কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করিয়া শান্ত স্বরে বলিলাম, বলুন।

তিনি বলিলেন, অনুরোধটা কিছু নয় শুধু বুলার বাসা ছেড়ে দাও।

আমি লজ্জায় মাথা নত করিলাম।

তিনি পুনরায় বলিলেন, বুলাটা এতদিন যাহোক ছিল এখন আবার মিলিটারি সাহেবদের সংগে মিশেছে। তোমার মত শিক্ষিত বয়সের ছেলের পক্ষে ওখানে থাকা ঠিক নয়।

আমি বলিলাম, বুঝেছি।

—আমাদের এখানে থাকবে?

আমি আবার চমকিয়া উঠিলাম।

তিনি বলিলেন, তোমার দাদা বলছিলেন তোমার কথা।

—আমার দাদা?

—হ্যাঁ…হ্যাঁ তোমার দাদা বৈ কি। তোমাদের মুখার্জীবাবু।

—তিনি আমার কথা বলছিলেন?

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। বলছিলেন ওঁর কাজ বেড়েছে একা পেরে উঠছেন না তুমি ওঁর সংগে থাকলে কাজের খুব সুবিধে হ'ত।

—আমার কাছে এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আমি মনের ভাব গোপন করিয়া সত্য কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি তা হ'লে রাজি।

—নিশ্চয়ই। তবে ··।
—তবে কী ?
—কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে।
—কেন ?
—জ্যাকের একজন মাষ্টার ঠিক না করে ওখান থেকে চলে আসা উচিত হ'বেনা।
—উচিত কী অনুচিত সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবেনা। দত্তবাবু সব ঠিক করে দেবেন ?
—মুখার্জী সাহেব এখন কোথায় ?
—শিলিগুড়ি। ওখান থেকে বাগডোগরায় গেছেন।
—কবে ফিরবেন ?
—দিন দশেক পরে।
—তিনি এলে আমাকে খবর দিবেন।
—দেব। তুমি কিন্তু রোজ বিকেলে এসে এখানে চা খেয়ে যাবে।

মুখার্জী গিন্নীর চায়ের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিলাম কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘলিতেছিলাম। ঠিকাদার মুখার্জী বাগডোগরা ফরেষ্টে গিয়াছে। মোহন সিং আসিতেছেনা। বাগডোগরা ফরেষ্টে কয়েকজন বিপ্লবী রহিয়াছে। সাধন সেনকে খবর দিলাম। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া বিপ্লবীদের নিরাপত্তার জন্য তাহাকে বাগডোগরা পাঠাইয়া দিলাম।
মাঝখানে কয়েকটি দিন চলিয়া গিয়াছে। বুলাবিবি ধকল সামলাইয়া উঠিয়াছে। আমি বাসা ত্যাগ করিবার কথা প্রকাশ করিতে পারি নাই। বুলাবিবি বাসায় থাকিলে কাঞ্চীরানী আমার সহিত খুব বড় বেশী কথাবার্তা বলিত না। কাঞ্চীরানীকে এই খবর বলিব বলিব করিতেছিলাম, বলিতে পারি নাই। ঠিকাদার মুখার্জীর বাসায় আমার আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, আর ইহাই হইবে আমার ফেরারী জীবনে লোকালয়ে শেষ আশ্রয় গ্রহণ। আমার নামে গ্রেপ্তারী হুলিয়ায়

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে। ঠিকাদার মুখার্জী যদি এই সংবাদ জানিয়া থাকে তবে সে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছে। তাহার কুতকর্মের উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধানের জন্য আমার ডান হাতের তর্জনী নাচিতে লাগিল। জাকের পড়াশুনার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিলনা। সকালে তাহাকে পড়াইতে বসিয়াছিলাম। কোন ফাঁকে যে সে উঠিয়া গিয়াছে খেয়াল করি নাই। আমার পিছন হইতে কাঞ্চীরানী ডাকিল, মাষ্টারসাব!

—উঁ।

—তোমার শরীর কি ভাল নেই?

—আছে।

—পাগলের মত এত কি ভাবছ।

—পাগলের মত!

—নয়ত কি। কোনদিকেই যে তোমার খেয়াল নেই। জাক নীচে নেমে গেছে।

—য়্যা।

—বাঃ বেশ মানুষ। বলো ত হয়েছে কী?

—তোমার বইনি কোথায়?

—বাসায় নেই।

—কোথায় গেল?

—বোধকরি সিংজীদের কুঠীতে।

—এখানে বসো কাঞ্চীরানী।

সে বসিল না। আমার পিছন হইতে সরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, কাঞ্চীরানী আমার চাকরি হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি। আমি যতখানি সহজ কণ্ঠে বলিয়াছিলাম, সে ততখানি সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে ভারী গলায় বলিল, ও কথা তুমি বইনিকে বোলো।

—তোমাকে জানালুম।

—কবে যাবে?

—আজ বা কাল যখন বুলাবিবি ছুটি দেবে।

—কোথায় যাবে ?

—আপাততঃ এই বাজারে থাকবো। তারপর নতুন মনিব যেখানে পাঠাবেন যাব।

—নতুন মনিবটা কে ?

—মুখার্জীবাবু।

—কি নাম বল্‌লে···ঠিকাদার সাহেব :

—হুঁ।

—বেশ। যেয়ো।

বুঝিতে পারিলাম কাঞ্চীরানী মুখার্জীর নাম শুনিয়া খুশী হইতে পারে নাই। সে ঘরের ভিতরে গিয়াছিল। সামান্ত সময় পরে ফিরিয়া আসিল। আমি বলিলাম, তুমি যে কিছু বল্‌লেনা কাঞ্চীরানী।

—আমি কি বল্‌ব। আমি বল্‌লেই তুমি শুনবে কেন মাষ্টারসাব।

—সে কী কাঞ্চীরানী, তোমার কথা শুনবনা এ তুমি ভাবতে পার ?

—আমি তোমার কেউ নই মাষ্টারসাব।

—তা ঠিক। তবুও চলছি বলো।

—ঐ বদমাশটার বাসায় তুমি থেকনা।

—কেন কাঞ্চীরানী ?

—প্রশ্ন করলে জবাব পাবেনা। তুমি যা মনে কর আসলে ঠিকাদারের বৌ কিন্তু ঠিকাদারের স্ত্রী নয়।

—কে বল্‌লে ? জানো ওদের মেয়ে আছে।

—মেয়েটা ঠিকাদারের নয়।

—অবাক কাণ্ড দেখছি। কাঞ্চীরানী, আমি কক্ষণো ভাবতে পারিনে এমনটি হ'তে পারে।

—তুমি ভাবতে পারনা বলে যে হবেনা, এ কেন হবে। হয়, মাষ্টারসাব হয়।

আমি অনেকক্ষণ মৌন থাকিলাম। কহিলাম, আচ্ছা ধর যদি ঠিকাদার মরে যায় তবে বৌটির কি হবে ?

—তোমার লোক দত্তবাবু আছে।

—দত্তবাবু! বলো কি কাঞ্চীরানী?

—আকাশ থেকে পড়লে দেখছি। মাষ্টারসাব, ওরা সব সময় হাতের সম্বল গুছিয়ে রাখে। আমার মা ছিল এমনি ধরনের।

—তোমার মা!

—বইনি তোমাকে বলেছিল মাষ্টারসাব ওর বাবা ছিল সাহেব, আর আমার বাবা বাঙালী।

—বলেছিল।

—আজ থাক। অন্য এক সময় তোমাকে সব বলবো। তুমি এখন বইনির কাছে কিছু বলবেনা। ও ক্ষেপে যাবে।

—আমাকে যে যেতেই হবে কাঞ্চীরানী।

—তুমি দূরে চলে গেলে বইনি মনে রাখবেনা। কাছে থাকলে হয়ত…।

—হয়ত কী?

—আঃ মাষ্টারসাব! তুমি কেবল সব কথা জানতে চাও। এ তোমার অন্যায়। তুমি যেতে চাও যাবে।

—তুমি কী মনেকর কাঞ্চীরানী তোমার বইনি আমাকে নিয়ে মুখার্জীর সংগে বিবাদ করবে।

—সে কথা তোমাকে আমি বলিনি মাষ্টারসাব।

—তবে যে বললে…।

—তোমাকে কিছু বলতে হবেনা মাষ্টারসাব। বইনিকে যা বলার আমি বলে ঠিক করে নেব।

যাক্ কাঞ্চীরানী একটি সংশয় হইতে আমাকে মুক্তি দিয়াছে। মানশির মুখের দিকে চাহিয়া আমার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। ঠিকাদার মুখার্জীকে সাধন সেন যদি শেষ করিয়া ফিরিতে না পারে আমাকেই এই কাজটি সম্পন্ন করিতে হইবে। সামান্য অর্থের মোহে

টিকাদার মুখার্জী যে অবস্থ কার্যে লিপ্ত হইয়াছে—উহার পরিণাম কি তাহা জানিবে। কাঞ্চীরানী জানিলনা কত আনন্দ কত খুশী আমি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আকাশ পরিষ্কার। কয়েক দিন পর সূর্য দেখা দিয়াছে। বারান্দায় কাঠের রেলিংয়ে কনুইয়ের উপর বুকের ভর রাখিয়া এক দৃষ্টে দূরের পাহাড় দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম। জ্যাক রাস্তা হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। কাঠের সিঁড়ির উপর তাহার পায়ের শব্দে ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম। সিঁড়ির মাঝপথে জ্যাক চিৎকার করিয়া ইংরাজীতে কহিল, তোমার বন্দুক আছে ?

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, না।

—এনি রিভলভার ?

—নো মাই ডিয়ার। হোয়াটস্ দি ম্যাটার ?

কার কথা কে শোনে। মুহূর্তের মধ্যে দেখিলাম ঘরের ভিতর হইতে জ্যাক ভোজালি হাতে করিয়া নীচে নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে আমি এক লাফে মাটিতে নামিয়া ছুটিয়া জ্যাকের হাত ধরিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে জ্যাক ?

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে জ্যাক হিন্দি ইংরাজী মিশাইয়া যাহা বলিল উহার অর্থ হইতেছে কে এক 'ডাম ব্লাডি'কে সে খুন করিবে। ব্যারাকের সিপাইরা দাঁত বাহির করিয়া রাস্তার উপর আমার ও জ্যাকের হাত টানাটানি দেখিতেছে। চা-বাগানের একদল কুলি যাইতেছিল। তাহারা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল। বহু কষ্টে জ্যাকের হাত হইতে উন্মুক্ত ভোজালি কাড়িয়া নিলাম। জ্যাক আমার হাতে এক কামড় বসাইয়া দিল। সে গরগর করিয়া বলিতে লাগিল, আমার মা'কে ওরা কেটে ফেলল। তুই কি না আমার হাতিয়ার কেড়ে নিলি। আমি স্তম্ভিত হইলাম।

বারান্দার উপর হইতে কাঞ্চীরানী কহিল, ঘরে আসুন মাষ্টারসাব।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জ্যাক একবার তাহার মাতৃস্বসার প্রতি চাহিল, তারপর দৌড়াইয়া বাজারে চলিয়া গেল। কাঞ্চীরানী পুনরায় কহিল,

উঠে আসুন বলছি। আমি বারান্দায় উঠিলাম। কাঞ্চীরানী আমার হাত হইতে ভোজালি লইয়া বলিল, ওটা সত্যি সত্যি একদিন মানুষ খুন করবে।

—কি সাংঘাতিক কথা। জ্যাক কাকে খুন করতে চায় আর কে সে বুলাবিবিকে কাটতে চাইছে।

—ওটা তেমন কিছু নয় মাষ্টারসাব। মাঝে মাঝে দু'একবার এমন হয়। এই বলিয়া কাঞ্চীরানী কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া পুনরায় বলিল, বইনির সংগে সিংজীদের বেশী ভাব। বেশী ভাব থাকলে কি হয় জানো?

—না।

—আমার সাহেবের মাতাজী কি যেন বলতেন লটখটি না কি যেন একটা বাংলা কথা।

—ও বুঝেছি কাঞ্চীরানী। যেখানে আঁটা আঁটি, সেখানে লট্‌খটি।

—তুমি ঠিক ধরেছ মাষ্টারসাব। সিংজী সেয়ানা পুরুষ বইনি ওর সংগে পারবে কেন। স্বার্থের সম্বন্ধ যেখানে একটুতে গণ্ডগোল হয়।

—তাইবলে মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবে!

আমার কথায় কাঞ্চীরানী ব্যথিত হইল। ধীর স্বরে সে বলিল, তোমরা ভদ্রলোক মাষ্টারসাব। তোমরা ঠিক জাননা পাহাড় মুলুকে ওটা চলে। আর এর জন্য দায়ী ত ঐ বুলা। মাষ্টারসাব, বুলা মানুষ নয় একটা কুকুর।

এই পর্যন্ত বলিয়া কাঞ্চীরানী দ্রুত পায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার হাতের ভোজালি দরজায় বাধিল। ঠক্ করিয়া শব্দ উঠিল।

আমি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, তেমনই রহিলাম। কাঞ্চীরানী এত স্পষ্ট কোথায়ও সে ছুর্বোধ্য নহে। সে যে বুলাবিবিকে কতখানি ঘৃণা করে তাহা বুঝিলাম। বুলা ও কাঞ্চী দুই ভগ্নি, অথচ তাহাদের উভয়ের দূরত্ব ব্যবধানের হিসাবে পাইলামনা। একান্ত নিরুপায় কাঞ্চীরানী বুলার আশ্রয়ে রহিয়াছে। ভিতরে ভিতরে সে অসহ্য বোধ করিতেছে বোধকরি আমারই মত, হয়ত আমারও বেশী। সিংজীদের আমি

চিনি না। জানিতাম তাহাদের ট্রাক ও বাসের ব্যবসা আছে। তাহাদের একজন আত্মীয় বিপ্লবী মোহন সিংয়ের আত্মীয়। মোটর মেকানিষ্টের কালিমাখা পোষাকে মোহন সিং তিস্তানদী পাড় হইয়া জলপাইগুড়ি হইতে লরী চালাইয়া আসে। দূর হইতে সিংজীদের বাসা দেখিয়াছি। আমার মতই কি ভীষণ কুৎসিত বাসায় বিপ্লবী মোহন সিংয়ের আশ্রয় জুটিয়াছে। আমি এই কথা ভাবিতেছিলাম। ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত গরগর শব্দ করিতে করিতে বুলাবিবি বাসায় ফিরিল। জ্যাক তাহার পিছনে ছিল। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই বুলা ফাটিয়া পড়িল। চিৎকার করিয়া কহিল, শালালোগকো ফাটাকমে ডুংগী।

সেই মুহূর্তে ঘরের দরজার আড়াল হইতে শুধুমাত্র কপালখানা বাহির করিয়া কাঞ্চীরানী আমাকে ইসারা করিল। আমি এক পা করিয়া সিঁড়ির কাছে আসিবার পূর্বে বুলাবিবি সিঁড়ির মুখ আটক করিয়া কহিল, কোথায় যাচ্ছ ?

আমি জবাব দিলাম না।

বুলাবিবি বলিল, দাঁড়াও। একটা দরখাস্ত লিখে দেবে।

আমি কহিলাম, বেশ। আমি একটু ঘুরে আসি তারপর লিখে দেব।

—এখুনি আসবে। খবরদার দেরি করবে না।

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দত্তবাবুর দোকান ব্যতীত আমার যাইবার জায়গা নাই। আমি সেখানে আসিলাম। দত্তবাবু সেলাই মেশিনে কাজ করিতেছিলেন। আমার প্রতি তাহার নজর পড়িতে এক ঝলক হাসি তাহার ঠোঁটে খেলিয়া গেল। আমি টুল টানিয়া বসিলাম। দত্তবাবু বলিলেন, তুমি এসেছ। বাঁচালে বাবা, নাহলে আমাকে যেতে হ'ত।

—কোথায় ?

—তোমাকে ডাকতে।

—কেন ?

—ও বাড়ী যাও। তোমার বৌদি বসে আছেন।

দত্তবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, মুখার্জী গিন্নী আমার প্রতীক্ষায় যে ছিলেন উঠানে প্রবেশ করিতে না করিতে বুঝিতে পারিলাম।

তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, এখনও তুমি ওই চুলোয় থাকবে ঠাকুরপো?

আমি কাঠের বারান্দার উপর সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলাম। আজ সকালে বুলাবিবি গোটা বাজারটা নাড়া দিয়া গিয়াছে। আমি নিশেকে বেতের চেয়ারে বসিলাম। মুখার্জী গিন্নী বলিলেন, আর যা বলো বুলার বোনটা কিন্তু ভাল। কী বলো ভাই!

তাঁহার ইংগিত টের পাইলাম।

তিনি পুনরায় বলিলেন, কথা বলছনা কেন?

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, মুখার্জী সাহেব এলে যা হয় করবো বৌদি।

তিনি কহিলেন, ওঁর অপেক্ষা করবে কেন?

—বাঃ তিনি যে আমাকে কাজ দেবেন।

আমার কথা শেষ না হইতে মুখার্জী গিন্নী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম। তিনি বহু কষ্টে মুখে আঁচল গুঁজিয়া হাসি থামাইয়া কহিলেন, পাহাড়ীদের কাছে থেকে দিন দিন তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে।

—ও কি কথা বৌদি?

—খোকা ছেলে। মুখার্জী তোমার চাকরি দেবার কে! তুমি থাকবে আমার বাসায়।

—অর্থাৎ?

—এরমধ্যে অর্থাৎ নেই। আজই তুমি ও বাসা ছেড়ে এখানে উঠে আসবে।

—কিন্তু···

—আবার কিন্তু? আমার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া তিনি বলিলেন, ও বুঝেছি। কাঞ্চীটাকে ছেড়ে আসতে তোমার মায়া হচ্ছে।

এতক্ষণ আমি সহ্য করিতে পারিতেছিলাম। আর পারিলাম না। আমার পৌরুষে আঘাতের প্রত্যুত্তরে তীব্র স্বরে কহিলাম, এ আপনার ভুল ধারণা।

—কি বললে তুমি! আমার ভুল!

—নিশ্চয় ভুল। কাঞ্চীরানীর ওপর আমার এক তিল মায়া নেই। তবুও যদি কাঞ্চীরানীর ওপর আমার এক বিন্দু স্নেহ থেকে থাকে তবে সে স্নেহের এতটুকু অসম্মান আমি সহ্য করবনা। আমি হলপ করে বলতে পারি তার মত চরিত্র·····।

—কি বল্‌লে তুমি, আমার কথা শেষ হইতে পারিলনা তিনি তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ওহো পাহাড়নীর আবার চরিত্র! সাবধান। এমনভাবে আমাদের অপমান তুমি করতে পারবেনা।

আমি বিমূঢ় স্তব্ধ হইলাম। মুখার্জী গিন্নীর চক্ষু দুইটি অকস্মাৎ জলে ভরিয়া উঠিল এবং তিনি ঘরের ভিতর ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভাংগিয়া পড়িল। আমি অপ্রতিভ হইলাম। বৌদিদির এত ভালবাসা, এত স্নেহ—সমস্ত যেন কপূরের মত উবিয়া গেল। তাহার এ কি চেহারা আজ দেখিলাম. একটি একটি করিয়া অনেক কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহার ব্যবহারে যত বেশী না খুশী হইয়াছি তাহার চেয় চের বেশী মুগ্ধ হইয়াছি। এই মুহূর্তে যাহা দেখিলাম আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল এই রাক্ষসী শয়তানীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া চলিয়া যাই। তবুও তেমনি ভাবে বেতের চেয়ারে বসিয়া রহিলাম। মুখার্জীর খবর আমার চাই।

—উঠে এসো ঠাকুরপো।

তাহার আহ্বানে আমার সংবিৎ ফিরিল। বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে আসিলাম। নিঃশব্দে খাটের এক পার্শ্বে বসিলাম। তিনি ইতিমধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া নিয়াছেন, তাহার কপালের উপর চুলে জলের চিহ্নে বুঝিলাম।

আমাকে কেন্দ্র করিয়া মুখার্জী বাড়ীর ভিতরে যে একটি কাহিনী অলক্ষ্যে ঘুরিতেছিল উহার সন্ধান এতদিনে পাওয়া গেল।

মুখার্জী গিন্নী আমার পাশে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার দাদা মানে তোমাদের মুখার্জীবাবুর কাছে তোমার কথা শুনে আমার মন চাইল তোমাকে ডেকে আনতে। শুনলুম তুমি সুন্দর গান করতে পার।

আমি তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলাম, মুখার্জী সাহেব শুধু আমার গানের কথা বললেন?

—না আরও বলেছিলেন। তোমার কথায় উনি বললেন ছেলেটাকে দেখে গরীব ঘরের ছেলে বলে মনে হয়না। চেহারার মধ্যে আভিজাত্য আছে।

—তারপর?

—অথচ মুখ ফুটে তোমাকে এ বাসায় আনার কথা বলতে পারিনে। তারপর যেদিন তোমার ফটো দেখলুম আর থাকতে পারলুমনা।

—য়্যা! আমার ফটো দেখলেন? কোথায়? কার কাছে?

—সে কি তুমি কিছু জানো না?

—দোহাই আপনার। বলুন কার কাছে আমার ফটো দেখলেন।

—কেন তোমাদের মুখার্জীবাবুর কাছে। তুমি আর বুলার ছেলে জ্যাক দাঁড়িয়ে রয়েছ।

—সত্যি বলছেন?

—বাঃ বেশ মানুষ। মুখার্জী নিজের হাতে ছবি তুলে নিয়েছে। ওদের ধারণা তুমি না কি ডাকাত দলের লোক।

—ওদের মানে কারা?

—তোমাদের মুখার্জী আর থানার দারোগা। এদিকে নাকি কোথায় ডাকাত দলের লোকেরা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

—আপনি বিশ্বাস করেন বৌদি?

—পাগল হয়েছ আমি বিশ্বাস করি এই কথা। সেদিন থেকে তোমার জন্য পাগল হয়ে গেলুম। কাজী তোমাকে কিছু বলেনি?

—না।

—আমি জানি ও বলতে পারে না। নিজের জিনিস কেউ-ই অপরকে দেয় না।

—আপনি বিশ্বাস করুন···।

—কি বিশ্বাস করব বলো? তুমি আর কাঞ্চী এক ঘরে এক লেপের নীচে রাত কাটাও নি? ও কি লজ্জায় যে তুমি পড়ে যাচ্ছ। এতে লজ্জার কি আছে।

আমার মাথা ঘুরিতেছিল। কোনমতে দুই হাতে খাটের রেলিং ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া নিলাম। মুখার্জী গিন্নী আরো কতগুলি কথা বলিলেন আমার কানে প্রবেশ করিল না। ঠিকাদার মুখার্জী গোপনে আমার ফটো তুলিয়াছে, মোহন সিং ও সাধন সেনের ফটো তুলিয়াছে কি না জানিতে পারিলাম না।

মুখার্জী গিন্নী বলিলেন, কাঞ্চীরানীকে বলেছিলুম এ বাসায় তোমাকে একবার পাঠাতে।

বড় কষ্টে আমি কহিলাম, আমার উচিত ছিল নিজে এসে পরিচয় করে যাওয়া।

—এলে পারতে। যাকগে। শেষে তোমাদের দত্তবাবুকে বলে কলে তোমাকে এনেছি। শুধু এনেছি নয় তোমাকে আমার সব দিয়েছি।

—ছিঃ বৌদি ছিঃ। আবার ও কথা বলছেন।

—ও! তুমি বিশ্বাস করছ না। বুঝেছি মুখার্জী টের পেলে আমাকে কেটে ফেলবে।

—তাইত উচিত।

—তোমার মুণ্ডু! মুখার্জী আমার কে?

—কি বললেন বৌদি! মুখার্জীবাবু আপনার কেউ নন?

—না। কেউ নয়। আমি ওকে ভালবাসিনে।

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি সহসা আমার ডান হাত তাঁহার হাতের মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই। আমি ওকে পেয়ে হারিয়েছি তোমাকে হারাতে পারবনা।

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং শরীরটা খাটের উপর পড়িয়া গেল। মুখার্জী গিন্নী আমার বুকের উপর তাহার মুখ গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, তোমার মত সে ছিল সুন্দর। তোমার মত কলেজের ছেলে। তাকে ভালবাসা দিলুম ভোগ করতে পারলুমনা। খুকু আমার পেটে। সে ভয়ে প্রাণ নষ্ট করল।

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি পুনরায় চুপ করিলেন। আমার হাতের আংগুলগুলি তাহার গলা টিপিয়া ধরিবার জন্য নাচিতে লাগিল কিন্তু আমার কব্জিতে তখন শক্তি ছিলনা।

আমার মনে কেবল একটা কথা মোচড় দিতেছিল, যুগলের খবর পাওয়া যাইতেছেনা—নিশ্চয়ই মুখার্জী তাহাকে সরাইয়া দিয়াছে। মুখার্জীর সন্ধানে সাধন সেন বাগডোগরা গিয়াছে। ইতিমধ্যে যদি মুখার্জী ফিরিয়া আসে তবে এই ঘরে এই খাটের উপরেই তাহাকে শেষ করিতে হইবে। প্রতিহিংসার আগুনে আমার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল। মুখার্জী গিন্নী আমার বুকের উপর কতক্ষণ মুখ গুঁজিয়া ছিলেন আমার খেয়াল ছিলনা।

—আচ্ছা ঠাকুরপো! তোমার দেখছি এত লজ্জা অথচ কাঞ্চীর পাশে অন্ধকার রাতে যখন থাক তোমার লজ্জা তখন কোথায় থাকে?

ইলেক্ট্রিকের শকের মত সহসা আমার শরীর লাফাইয়া উঠিল। মুখার্জী গিন্নী খাটের উপর ছিটকাইয়া পড়িলেন। শুধু ধপ করিয়া শব্দ হইল: এবং খাটের অপর ধারে খুকু ঘুমাইতেছিল সে জাগিয়া উঠিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। আমি সক্রোধে বলিলাম, কাঞ্চীরানীর কতটুকু আপনারা জানেন? আর যা জানুন দয়া করে ওকে নিয়ে তামাসা করবেননা। এই বলিয়া আমি দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পার্বতীপুর রেল ষ্টেশনে যুগল ধরা পড়িয়াছে। এই সংবাদে আমার বুকের পাঁজর ভাংগিয়া যাইতেছিল। মোহন সিংও শেষ বিদায় লইয়া লরীতে উঠিল। দূর হইতে দেখিলাম লরীখানা চা বাগানের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি আর এখানে নিরাপদ বোধ করিতেছিনা। অথচ নির্দেশ ব্যতীত স্থান ত্যাগের উপায় নাই। আমাদের পথের পরিবর্তন হইয়াছে। কালিঙপংয়ের ভিতর দিয়া তিব্বত অভিমুখে একদল বিপ্লবী রওনা হইয়া গিয়াছেন। ঐ দলে জয়প্রকাশ নারায়ণ রহিয়াছেন না তিনি আসিতেছেন এই খবরটা পরিষ্কার জানিতে পারিলাম না। যুগলের উপর আমাদের ভার ছিল, তাহার অভাবে আমরা দলের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জলপাইগুড়ির বাজারে কবিরাজ মহাশয়ের আস্তানায় বিভূতি আসিয়া থাকিলে আমার খবর সে পাইবে। মোহন সিং যাহা বলিয়াছিল মনে হইতে লাগিল বিভূতি ঐখানে আসিলেই ধরা পড়িবে। আর একটা খবর পাইলাম জলপাইগুড়ির জেলখানায় একজন সি, আই, ডি রাজবন্দীর ছদ্মবেশে রহিয়াছে। কংগ্রেসের সুরেন্দ্র ঘোষ, খগেন্দ্র দাশগুপ্ত জলপাইগুড়ির জেলে আছেন তাঁহাদের নিকট এই সংবাদ অবিলম্বে পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার। অথচ কোন উপায় আর দেখিতেছিনা। মোহন সিং তাহার রিভলভার আমাকে দিয়া গিয়াছে। শেষ লড়াই যতক্ষণ পারি করিতে পারিব, একটা বড় সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলাম। সাধন সেন ফিরিতেছেনা তাহার জিম্মায় কমলা বাগিচায় যে অস্ত্রশস্ত্র আছে উহা আমাদের সাত রাজার ধন। জানিনা কোথায় কোন কমলা বাগিচায় সাধন থাকিত। আর জানিলেই বা কি সাধন কোথায় কোন জংগলে অথবা পাথরের ফাঁকে রাইফেল লুকাইয়া রাখিয়াছে একমাত্র সে ব্যতীত আর কেহ খুঁজিয়া পাইবেনা।

বহু চিন্তায় সারাদিন ছটফট করিতেছি। মনে হইতেছে আমি যেন কাহাদের নজরবন্দী রহিয়াছি।

—মাষ্টারসাব!

কাঞ্চীরানীর আহ্বানে মাথার নীচ হইতে বাহু টানিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম।

—মাষ্টারসাব···খাবে এসো।

পুনরায় কাঞ্চীরানী ডাকিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বুলাবিবি জাকে এখনও ফেরেনি?

—ওদের ফিরতে রাত হবে, কাঞ্চীরানী বলিল। জাকুকে সঙ্গে লইয়া সকালে বুলাবিবি বানারহাটে গিয়াছে। আমি সারাদিন ঘরে রহিয়াছি। কেবল আশংকা হইতেছে একটা গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেছি। আমাকে নীরব দেখিয়া কাঞ্চীরানী বলিল, তোমার কী হয়েছে মাষ্টারসাব? তিনদিন তুমি কিছু খাচ্ছনা। তোমার শরীর কী ঠিক নেই?

—কিচ্ছু হয়নি। শরীর ভাল আছে। যাও কাঞ্চীরানী আমাকে বিরক্ত কোরোনা।

আমার কথার ঝাঁজে সে বিস্মিত হইল। আমার সম্বিৎ ফিরিল। হাত বাড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া নিকটে আনিলাম।

—আঃ ছাড়ো, অস্ফুট শব্দ করিয়া সে হাত টানিয়া লইতে ব্যর্থ হইল। আমার পাশে কাঞ্চীরানীকে বসাইলাম। আমি বলিলাম, সত্যি কাঞ্চীরানী আমার কিচ্ছু হয়নি।

সে বলিল, ঠিকাদার সাহেবের বাসায় না গেলে ভাল করতে।

—ও কথা নয় কাঞ্চীরানী। আচ্ছা মুখার্জী সাহেবের বৌ আমার কথা তোমাকে কিছু বলেছিলেন?

—হুঁ।

—আমাকে বলেনি কেন?

—মাষ্টারসাব! ওরা জাত ভাল নয়? না···না আমি অন্য জাতের কথা বলছি। আমার বইনিকে দেখ্‌ছ। ওরা যে ভালবাসা হারায় তা কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

এই পর্যন্ত বলিয়া কাঞ্চীরানী চুপ করিল। তাহার কথায় আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিলনা এবং প্রসংগটিতে মন দেবার মত অবকাশও ছিলনা।

সে পুনরায় বলিল, জানো মাষ্টারসাব! যারা পয়লা নম্বরে ভালবাসা হারায় তারা যখন আবার ভালবাসা চায় শুতে কোনদিন তৃপ্তি পায়না কেবল 'আদমী' পাল্টায়।

—তাতে আমার কি?

—ওরা যাদু জানে। তোমার ওপর ওর নজর ছিল।

—তুমি টের পেলে কি করে?

—আমরা টের পাই।

—আমার খুব ক্ষতি করেছ কাঞ্চীরানী। ওদের বাসায় আমার আরো আগে যাবার দরকার ছিল।

—বলো তোমার কি ক্ষতি করেছি?

—এ কথা তোমাকে বলতে পারবনা কাঞ্চীরানী।

—তোমাকে বলতেই হবে মাষ্টারসাব।

—আমার অনেক কথা ছিল যা তোমার নিকট এখন বলা চলেনা।

—কেন?

—এই কথাটি শুধু মনে রেখ কাঞ্চীরানী, আমার প্রয়োজন তোমার ঐ ঠিকাদার সাহেবের মেয়েমানুষটিকে নিয়ে নয়।

—ওঃ তাই না কি!

এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি কহিলাম, সকালে যে লোকটি তোমার সংগে কথা বলে গেল সে কে?

—আগরআলার লোক।

—সে কি বললে?

—সব কথা কী তোমাকে বলতে হবে মাষ্টারসাব।

—হাঁা হবে।

আমার দৃঢ় কণ্ঠে সে সচকিত ভীত হইল।

আমি পুনরায় বলিলাম, কাঞ্চীরানী তুমি সব জাননা আর আমিও

তোমাকে বলতে পাচ্ছিনা। নইলে এমন কথা বলতামনা। বলো লোকটা কে ?

—বললাম যে আগরআলার লোক।

—কেন এসেছিল ?

—খবর দিতে।

—কিসের খবর ?

—এ কথাও তোমাকে বলতে হবে, এই বলিয়া কাঞ্চীরানী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ঠিকাদার সাহেবের বাসায় তুমি গিয়েছিলে সেই খবর।

এতক্ষণ পর আমি আমার নিজের অবস্থা ধরিতে পারিলাম। উত্তেজনা সংযত করিতে পারিতেছি না। আমাকে নীরব দেখিয়া সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া সে পুনরায় কহিল, ভয় নেই মাষ্টারসাব ও কথা লোকটি বলেনি। বইনির খবর দিয়ে গেল। বুলা বলে পাঠিয়েছে ওদের ফিরতে রাত হবে। বা···রে আবার শুয়ে পড়লে যে।

—আমার ক্ষিধে নেই। তুমি খেয়ে নাও কাঞ্চীরানী।

—অল্প করে দুটো খাবে চলো।

—তুমি দেখছি নেহাত বাঙালী মেয়ে। বলছি ত তুমি খেয়ে নাও।

—রোজ রোজ উপোস্ করছ কেন ?

—একদিন না খেলে কী উপোস্ হয় কাঞ্চীরানী ?

—একদিন কি বলছ ! এ কদিন ধরে দেখছি তুমি খাচ্ছনা। খাবার সব পড়ে থাকে আর তুমি কি সব চিন্তা কর।

—চলো। কি খেতে দেবে দাও।

জানালার ভিতর দিয়া একদৃষ্টে পাহাড় দেখিতেছি। মেঘলা দিন। ধূসর পাহাড় দেখা যায়। জানিনা ঐ পাহাড়ের কোথায় কোন কমলা

বাগিচায় সাধন সেন রহিয়াছে। খবর পাইয়াছি বাগডোগরা ফরেষ্টে সে ঠিকাদার মুখার্জীকে রিভলভরের গুলীতে শেষ করিয়াছে। আমার মনে যে আগুন জ্বলিতেছিল নিভিলনা। মাত্র কিছুদিন পূর্বে এই কার্যটি সম্পন্ন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই যুগল ধরা পড়িতনা। গুরুতর খবর আসিয়াছে আজ রাত্রের মধ্যে যেরূপ করিয়া হউক এই আস্তানা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। বানারহাট ষ্টেশনে ও রাস্তার চৌকিতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের স্পাইয়েরা নজর রাখিয়াছে। আমাকে শিলিগুড়ির আস্তানায় যাইতে হইবে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে রাত্রের মধ্যে সাধন সেনের নিকট ভূটান পাহাড়ে পৌছাইতে হইবে। জলপাইগুড়ির ডোগরা কোম্পানীর কর্মচারী হাজু গুপ্ত বহু কৌশলে সংবাদ আনিয়াছে। সে আরও বলিল বানারহাট থানায় প্রচুর গোর্খা ফোর্স আসিতেছে। অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে পালাইবার পথ নাই। আমাকে হয় আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে অন্যথায় শেষ আঘাত হানিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তথাপি দলের নির্দেশে শিলিগুড়ির আস্তানায় পৌছাইবার চিন্তা করিতে লাগিলাম। সারাদিন বন্ধ ঘরে বসিয়া ভাবিতেছি। রাত্রের অন্ধকারে পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব নহে। ডলিকে মনে পড়িল। সে এখনও চা-বাগানে দিদির বাসায় আছে কি না জানিনা। যদি কোন মতে একবার সেখানে পৌছাইতে পারিতাম তবে হয়ত বানারহাট এলাকা অতিক্রম করা যাইত। সান্যাল সাহেব ঘেষা মানুষ তাঁহার সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারিনা। আমার ঘরের দরজা বন্ধ বলিয়া কাঞ্চীরানী বিকালে চা আনে নাই এবং বিরক্তও করে নাই। প্রতি মুহূর্তে আমি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। কোমরে কার্তুজভর্তি রিভলভর লুকাইয়া রাখিয়াছি। জ্যাককে পড়াইতে বসি নাই। বুলাবিবি আজ আবার সাজিয়া গুঁজিয়া জীপে বাহির হইয়াছে।

অনেকক্ষণ হইল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতি সন্তর্পণে কাঞ্চীরানীর দরজায় হাতের আঙুল ঠুকিয়া মৃদু ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিলাম। সে দরজা খুলিয়া দিল।

আমি ফিস্ ফিস্ করে বলিলাম, ওদিকের দরজা বন্ধ আছে ?

—আছে। তোমার কী হয়েছে মাষ্টারসাব ?

—জ্যাক ঘুমিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—ওকে তুলে ঐ ঘরে বুলার খাটে দিয়ে এসো।

—কেন ?

—যা বলছি শোনো।

—তুমি ক্ষেপেছ মাষ্টারসাব।

—আঃ কাঞ্চীরানী ! যা বলছি শোনো।

—তোমাকে দেখে ভয় করছে। তা হ'লে তুমি কি সত্যি ঠিকাদারকে খুন করেছ ?

—মুখার্জী এখানে খুন হয়নি।

—সিংজীরা বলছে এ কাজের মধ্যে তুমি আছ।

—তুমি বিশ্বাস কর কাঞ্চীরানী—ঐ স্ত্রীলোকটির জন্য এ কাজ আমি করিনি।

—দাঁড়াও.....দাঁড়াও আমি জ্যাককে ও ঘরে রেখে আসি।

এই বলিয়া কাঞ্চীরানী জ্যাকের ঘুমন্ত শরীর তুলিয়া পাশের ঘরে গেল। আমি তাহার উপর নজর রাখিলাম। সে যখন এই ঘরে ফিরিয়া আসিল আমি লণ্ঠনের আলো নিভাইয়া দিলাম। হঠাৎ অন্ধকারে কাঞ্চীরানী ভয় পাইল এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এ কী করলে মাষ্টারসাব।" আমি দুই পা অগ্রসর হইয়া কাঞ্চীরানীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহার খাটের উপর ঠেলিয়া দিলাম। সে চিৎকার করিল না। তাহার নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি বুলার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শিকল আঁটিয়া দিলাম। এবং কাঞ্চীরানীর খাটের পাশে বাহিরে যাইবার দরজায় পিঠ রাখিয়া কহিলাম, হয়ত অনেকক্ষণ এ অবস্থায় তোমাকে থাকতে হবে কাঞ্চীরানী। তারপর বুলাকে নিয়ে গাড়ী এলে আমি চলে যাব।

কাঞ্চীরানী কথা বলিল না।

আমি বলিলাম, তোমার কোন ভয় নেই কাঞ্চী। তোমার কোন ক্ষতি আমি করবনা।

সে বলিল, এ তুমি কী আরম্ভ করেছ। আলো নিভালে কেন?

—তোমার কোন ক্ষতি আমি করবনা।

—তবুও বলছি আলো জ্বালো।

—না। অন্ধকারে বেশ আছি।

সে আর কোন কথা বলিল না। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নহে, বহু সময় পর্যন্ত অন্ধকারের মত নিঃশব্দ জমাট বাধিয়া রহিল।

সে প্রথম নীরবতা ভংগ করিল। কহিল, তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ?

—জানি না।

—আবার ফিরবে ত মাষ্টারসাব?

—না। বুলার চিঠির প্যাডের শেষ পাতায় আমার দিদির ঠিকানা লেখা আছে।

—ঢাকার?

—হাঁ। তুমি ইচ্ছা করলে ওখানে যেতে পার।

—আমি যাব মাষ্টারসাব।

—যেও। আমার কথা বললে তিনি বুঝতে পারবেন।

—মাষ্টারসাব!

—বলো!

—তুমি কোনদিন কোন মেয়েকে ভালবাসনি?

—আমাদের ভালবাসতে নেই কাঞ্চীরানী।

—সত্যি বলছ?

—হাঁ। সত্যি বলছি।

—সত্যি তুমি ঠিকাদার সাহেবকে খুন করনি?

—না।

—আশ্চর্য। তুমি তবে এমন ভাবে দু'দিন ধরে লুকিয়ে আছ কেন?

—সে অন্য কথা। কাঞ্চীরানী আমি চলে গেলে হয়ত ভোর রাত্রে জানতে পারবে।

—তুমি তবে পুলিশের ভয় পাচ্ছ ?

—ভয় নয় কাঞ্চীরানী। পুলিশকে আমি ভয় পাইনে। আমি চলে গেলে তোমাকে ধরে নিয়ে অনেক কথা পুলিশের লোক হয়ত জিজ্ঞাসা করবে।

—কেন মাষ্টারসাব ?

—বাঞ্জারের সবাই জানে তুমি আমার সংগে এক ঘরে রাত কাটিয়েছ।

—ও কথা ত বুলা রটিয়েছে।

—য়্যা! বুলা রটনা করেছে ? বলো কী কাঞ্চীরানী ?

—তুমি চলে গেলে বইনি আমাকে মেরে ফেলবে।

—যত শীঘ্র পার চলে যেও। আচ্ছা বুলা এমন বিশ্রী কথা রটালে কেন ?

—তুমি জানোনা মাষ্টারসাব বইনি কি চায় ? ও কি চায় জানো—চায় আমি মিলিটারি লোকের কাছে……।

সে আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। বুলার প্রতি আমার এতটুকু ক্রোধ ছিল না। আমার পলায়নের শেষ চেষ্টা বুলার সাহায্যে সম্ভব হইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। শেষ পর্যন্ত একটি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি। গভীর রাত্রে যখন বুলাকে লইয়া জীপগাড়ী আসিবে যে কোন প্রকারে ড্রাইভারের কবল হইতে গাড়ীখানা ছিনাইয়া নিতে পারিলে ঐ গাড়ীতে বানারহাট অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিব। ঘরের বাহিরে কিসের একটা শব্দ কানে আসিতেই সতর্ক হইলাম এবং কোমরের বেল্ট হইতে রিভলভর বাহির করিয়া প্রস্তুত হইলাম।

কাঞ্চীরানী মৃদু স্বরে বলিল, তুমি থাবেনা মাষ্টারসাব ?

—চুপ, শব্দ করিয়া আমি তাহাকে থামাইয়া দিলাম। মনে হইল একটা পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়ির উপরে উঠিল। শেষবারের মত আমি প্রস্তুত হইলাম। কাঞ্চীরানী তাহার খাটের উপর বসিয়া আছে। আমি রিভলভর হইতে গুলী ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেই বাহির হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ঘরের ভিতরে আসিবে। কাঞ্চীরানীকে সাবধান করিবার মত অবকাশ নাই। তথাপি কয়েক পা পিছনে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলাম, জলদি মেঝের ওপর শুয়ে পড়।

সেই মুহূর্তে দরজায় আমার নাম যাহার কণ্ঠে শুনিতে পাইলাম, আমি আত্মজ্ঞান হারাইয়া দরজার ড'াসা খুলিয়া এক লাফে অন্ধকারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

এই আমার সাধন সেন।

সাধন আমাকে ঠেলিয়া ঘরে আসিল এবং দরজা বন্ধ করিয়া টর্চের আলো ফেলিল। কাঞ্চীরানী চমকিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, ও কাঞ্চীরানী।

সাধন বলিল, খুব ভয় পেয়েছে। ওর দিদি কোথায়?

আমি বলিলাম, বাসায় নেই।

সাধন বলিল, খেয়েছিস্?

—না।

—চট্ করে যা পারিস খেয়ে নে। সময় নেই এক্ষুণি বের হ'তে হবে।

—তাই চল্। আমার কিধে নেই।

এতক্ষণ পর কাঞ্চীরানী বলিল, তুমি ক'দিন কিছুই খাওনি মাষ্টারসাব।

সাধন সবিস্ময়ে বলিল, আরে এ দেখি চমৎকার বাঙলা বলে।

—আমি খেতে দেব মাষ্টারসাব।

—তুমি নামবেনা কাঞ্চীরানী। সাধন, আর কত দেরী।

সাধন বলিল, মোহন সিং লরী ষ্টার্ট করে হর্ণ বাজালে আমরা নেমে যাব।

—মোহন সিং!

—আমাদের নিতে ও ফিরে এসেছে। ভয়ডর ওর নেই। মারোয়াড়ীদের চা'ল নিয়ে সিংজীর লরী এক বাগানে যাচ্ছে। ঐ লরীতে আমাদের যেতে হবে।

কাঞ্চীরানী ডাকিল, মাষ্টারসাব।

—উঁ।

—তুমি একবার শুনবে।

—বলো।

—কাছে এসো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট গেলাম। অন্ধকারে খাটের সহিত আমার পা ঠেকিল।

কাঞ্চীরানী বলিল, চার রোজ তুমি কিছু খাওনি। একটু খেয়ে নাও।

সাধন হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, না এ দেখছি খাঁটি বাঙালী মেয়ে।

—আঃ সাধন, সাধনকে থামাইয়া দিলাম। সাধন টর্চের আলো জ্বালিয়া বলিল, কি খাবার আছে দেখি ?

—রোটি আছে। কারি, বাটার, শুগার সব আছে। এনে দেব খাবে ?

—এ যে দেখছি হোটেল। তুই খেয়ে নে।

—দেব মাষ্টারসাব।

—থাক্ কাঞ্চী। তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

অন্ধকারে অস্ফুট 'ধ্যেৎ' শব্দ করিয়া কাঞ্চীরানী আমার বুকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল। সাধন বলিল, যদি বেঁচে থাকি তবে একদিন এসে তোমার রুটি কারি খেয়ে যাব। যদি পার তবে গোটা কয়েক টাকা দিতে পার।

—টাকা! কাঞ্চীরানী উচ্চারণ করিল।

কাঞ্চীরানীর অসহায় কণ্ঠস্বরে যে সম্পদ ছিল ইহা সাধন জানিলনা। বুলার সহিত কাঞ্চীর দূরত্ব ব্যবধান যে কতখানি ছিল, আমি বুঝিতে পারিলাম।

সাধন বলিল, যদি থাকে তবে দিতে পার।

কাঞ্চীরানী বলিল, বইনির কাছে তুমি অনেক টাকা পাবে মাষ্টারসাব। কিন্তু বইনি যে নেই।

সাধন বলিল, তোমার বাক্সে নেই ?

কাঞ্চীরানী বলিল, আমার টাকা নেই। সোনার একটা আংটি আছে।

—না···না···না। সোনা নয়।

—সাধন!

—কি বলছিস্।

—হারু কিছু দিয়ে গেছে।

—বাঁচালে। এবার তবে ভাবনা নেই।

এই, বলিয়া সাধন এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, একটা কাপড় দিয়ে ছুঁড়ীটার মুখে বেঁধে দে যাতে আমাদের যাবার সময় চেঁচাতে না পারে।

—না। ওটার দরকার হবেনা। ও চিৎকার করবেনা।

—বিশ্বাস কি ?

—আমি বলছি।

—তুই বলছিস্। বেশ যদি চিৎকার করে ত আমার এটা রেডি থাকলো।

এই বলিয়া সাধন বাম হাতে টর্চ্চ বালিয়া তাহার ডান হাতের রিভলভরের উপর ফেলিল। এক ঝিলিক আলোতে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম কাঞ্চীরানীর চোখের জলে দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে। সাধন অবাক হইয়া বলিল, ও দেখি কাঁদছে।

—হ্যাঁ কাঁদছে। ওকে কাঁদতে দাও সাধন। ও বেচারী বড় দুঃখী। আমার কথা শেষ হইবার পূর্বে অন্ধকারে বুঝিতে পারিলাম কাঞ্চীরানী বালিশের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শুনিয়াছি চোখের জলের না কি ভাষা আছে। ডলির চোখের জল নিজের চোখে দেখিলাম। কাঞ্চীরানীর চোখের জলের সহিত উহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বিশ্বদুনিয়ায় কাঞ্চীরানীর আর কেহ নাই, কোথায়ও এতটুকু আদর আর স্নেহ পাইলনা। আমার নিকট সে কি পাইয়াছিল তাহার হিসাব তখন করি নাই। পিতৃ-পরিচয়হীনা ভিন্ দেশী এই যুবতী যদি আমার নিকট কিছুমাত্র পাইয়া থাকে তবে উহা তাহারই থাক। জীবনমৃত্যুর প্রশ্নের মাঝখানে আমার বুকের ভিতর হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইবার পথ পাইলনা। কাঞ্চীরানীর উপর আমার মন নরম হইল। সাধন অপ্রতিভ হইল। সে হয়ত সেই মুহূর্তে এতখানি তলাইয়া দেখিলনা ; অথবা হয়ত অনেক কিছু ধারণা করিল। এই দৃশ্যের সম্মুখে ধারণা সৃষ্টি অমূলক নহে, অপ্রত্যাশিতও নহে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বহু খবর রাখে। কোনদিন জানিলনা সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমরা দুইজন গুলীভরা রিভলভর হাতে করিয়া বুলাবিবির

ঘরের দরজার পাশে বহু সময় দাঁড়াইয়া ছিলাম। অদূরে বিছানার উপর কাঞ্চীরানী অশ্রুপাত করিতেছে। চামুচি বাজারে আগরআলার মোকাম হইতে লরীর এঞ্জিন ষ্টার্ট ও হর্ণ বাজিবার প্রতীক্ষা করিতেছি। আমাদের সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মৃত্যু-পথের উপর দিয়া মোহন সিং তাহার বিপ্লবী জীবনের এক বিরাট কর্তব্য সাধনের পথে নামিয়াছে।

লরীর এঞ্জিন ষ্টার্টের শব্দ উঠিল। একবার ইচ্ছা করিল সাধনের হাত হইতে টর্চ লইয়া জ্বালিয়া শেষ বারের মত রোরুদ্যমানা অশ্রুপ্লুতা কাঞ্চীরানীকে দেখিয়া লই। পারিলাম না। সাধন সেন কনুইয়ের আঘাতে দরজার ডাঁসা ঠেলিয়া ফেলিল।

আজ কেবল মনে হইতেছে পাহাড়তলির আমার সেই কাঞ্চীরানীকে একবার 'বিদায়' সম্ভাষণ জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার এই ত্রুটি আমাকে অহরহ বিঁধিতেছে।

শেষ